KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ~~২৫২~~ ২৫২ডি/১ [illegible] ব্লক-এ, কলকাতা-৫৫
Collection : KLMLGK	Publisher : দেবযানী মুখোপাধ্যায়
Title : অনার্য সাহিত্য (ANARJYO SHITYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1 2 3 4 5	Year of Publication : Summer 1997 Aug 1997 Dec 1997 Dec 1998-99 May 1999
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : ?	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনার্য সাহিত্য

স্বাধীন লেখকদের প্রমুক্ত উচ্চারণ

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কবিতা ঃ প্রভাত চৌধুরী, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প ঃ সুবিমল বসাক

নিবন্ধ ঃ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিত রায়

দীর্ঘ কবিতা ঃ শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, মৌলিনাথ বিশ্বাস, শুভব্রত চক্রবর্তী, সলিল চক্রবর্তী

ব্যক্তিগত গদ্য ঃ অমিত্রাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা ঃ শঙ্করনাথ চক্রবর্তী, অমর চক্রবর্তী, সুকুমার চৌধুরী, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু বিশ্বাস, বৃন্দাবন দাস, অশোক দে, অমর চক্রবর্তী, রাজা দাস, অনিন্দ সিন্‌হা, তিমির দেব, শুভঙ্কর দাশ

কাব্য পরিক্রমা ঃ শুভব্রত চক্রবর্তী

ত্রয়োদশ বর্ষ
নবপর্যায় * চার
শীত, ১৯৯৮-৯৯

নবপর্যায়-চার, শীত ১৯৯৮
অনার্য সাহিত্য
কথাঃ

অমর্ত্য আলোক

বামনতন্ত্রের অভিশাপ ও অবসাদে যখন আমরা বাঙালিরা, অসুস্থ, অতৃপ্ত ও আতঙ্কিত তখন শ্রী অমর্ত্য সেন মহাশয়ের অর্থনীতিতে— কল্যানমূলক, মানবধর্মী অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি এক বর্ণময় উদ্ধার।

শ্রী সেন কেন এতদিন পরে এ সম্মান পেলেন তা ভেবে আকুল না হয়ে আমাদের মনে রাখা দরকার এ সত্য যে সমস্ত বিকাশ ও বিবর্তনের লক্ষ্য মানুষ এবং সে মানুষের জীবন যার বা যাদের কর্মে, চিন্তায়, চেতনায় পরিব্যাপ্ত তাকে বা তাদের ভুলে থাকার প্রচেষ্টা হাস্যকর, মূঢ়তামাত্র।

চরম বাজার অর্থনীতির প্রবক্তা এবং রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক সুরক্ষার বিরোধী তাত্ত্বিক, আমলা, দালাল ও বাজারী আনন্দের মুখপত্রদের মসৃণ গণ্ডদেশে এই নোবেল একটি নির্ভুল, নিষ্কলুষ চপেটাঘাত।

সমস্ত ভারতবর্ষ যখন ভোগবাদে নিমজ্জিত, আদর্শহীন, তমসাচ্ছন্ন ও ব্যক্তিচরিতার্থতায় নিমগ্ন; ভারতবর্ষের নব প্রজন্ম যখন শিকড়হীন, ব্যভিচার-সংস্কৃতি, রীতিহীন জীবনযাপন ও স্বার্থপরতায় আপ্লুত তখন অমর্ত্যর এ মর্ত্য স্বীকৃতি কালের ঋত বিধান, নতুন উৎসাহে নিজেদের বিচার করার সুসময়।

বহুদিন পর এক সত্যব্রত তাপসের উদ্বোধনে আমরা আনন্দিত, আলোকিত। আমাদের আশা বাঙলার জ্ঞানচর্চার ধারা আবারও পরাজিত করবে মুদ্রাচর্চার ভ্রষ্ট আচার, অনৃত উল্লাস ও অশুদ্ধ অবিবেচনাকে।

চাকর-বাকরের সংস্কৃতি

সংস্কৃতির ব্যাপারটা এখন মোটেই সংস্কৃত নয়। বরং বলা চলে জো-হুজুরের খেউড়। আর জো-হুজুরে কাজকর্ম—সবটাই চাকর-বাকর তথা ক্রীতদাস-দের। কেউ আনন্দবাজারের বাসন মাজছে তো কেউ প্রতিদিনের ঘর মুচছে আবার কেউ রাইটার্সের জুতো সাফ করছে এবং সেই সুবাদে নিজেদের কেউকেটাও ভাবছে। অর্থাৎ মনুমেন্ট-কেন্দ্রিত সংস্কৃতি থেকে দূরে যারা—তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ায় তারা খুবই দক্ষ, মাঝে মাঝেই সাহিত্য সভায় সভাপতি বা প্রধান অতিথি হয়ে যাওয়া। চোব্য চোষ্য খাওয়া এবং অবশ্যই বিলিতি বোতল টানা। নিজের পয়সায় ধেনো জোটে না যাদের তারা ওই বিগ্ হাউসের দাস্যবৃত্তির সুবাদে সাহিত্য-সংস্কৃতির শো-বিজনেসে দিব্যি বক্স অফিস পাচ্ছে। চারপাশে স্তাবক জুটে যাচ্ছে। যারা দিনরাত নামকীর্তন জারী রেখেছে। ছোটশহর আধাশহর গ্রাম-গঞ্জে, এরাই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ধ্বজা ওড়ায় এবং চালু শো-বিজনেসে ভিড়ে পড়ার সুযোগ খোঁজে, কাজেই লিট্‌ল ম্যাগাজিন। লিট্‌ল ম্যাগাজিন বোলে উদ্বাহু নৃত্যের কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্যই এক্‌সেপ্‌সন তো আছেই। ভরসা—তার সংখ্যা ইদানীং বাড়ছে এবং তারা 'কুরশী'র পায়া ভেঙে দিতে নিজেদের শাণাচ্ছে-ও। কুরশীর মালিকরা—তা সে প্রফুল্ল সরকার অথবা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকার, যেই হোক তারা নিজেদের তরোয়াল ঘুরিয়েই চলেছে। সেখানে মাথা দিয়ে ধন্য হচ্ছে একদিনের 'তরাই কান্দে গো'-র গায়ক, একদিনের আগুনখাকী রমণী—নাম কিনতে যে কোন 'স্বনামধন্য-বিছানা'-ই যার কাছে এখন আত্মবৎ, দাড়িগজানো কবি—যাকে ছুটতে হয় অমৃতকুম্ভের সন্ধানে—বস্তাপচা রিপোর্ট লেখার জন্যে। উপায় নেই গোলাম হোসেন—খাতায় নাম লিখিয়েছ যাদু—এখন বাবু বাছলে চলবে? এখন তাই গঙ্গা মেকং এক করিবার অঙ্গীকার অ্যাসেম্বলীর চেয়ার দখলের লড়াই-য়ে ঢুকে গ্যাছে। ক্রীতদাস বশংবদদের সংস্কৃতি যারা লালন করছে—(তাদের স্বার্থে তারা করবেই) প্রয়োজন ফুরলেই এই পোষ্যদের পদাঘাতে সরিয়ে দিতে এক লহমাও নষ্ট করবে না—এতো দেখাই যাচ্ছে। ট্যা ফোঁ করেছ কি দূর হও। আহা রে আনন্দ বাগচি, বিমল কর; চেয়ার গ্যাল তো ভবিষ্যৎ গ্যাল। এ সব চাপা দিতে মালিকেরা তাদের সরিয়ে দেওয়া দাসেদের ডেকে এনে আবার পুরস্কারের তাপ্পি দেওয়ার কাজ সারে। পুরস্কার রিফিউজ করার সাহস এদের নেই। জাঁ পল সার্ত্রে অথবা সোমনাথ হোড় আর ক'জন হোতে পারে। আমাদের মননে ময়ূরকণ্ঠী রঙের বিন্যাস এঁদের জন্যেই। এঁদের মুখ চেয়েই আমাদের বেঁচে থাকা, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পাতাকে ল্যাবোরেটারী কোরে তোলা, কুরশীতন্ত্রের সেবক চিনে নেওয়া। না হোলে প্রবঞ্চক-দস্যুদের নিঃশ্বাসে সংস্কৃতি-সাহিত্যের পরিবেশ দূষিত হোতে হোতে রিক্ত হোয়ে যাবে একদিন।❑

বিতর্কিত সাংবাদিক ও গদ্যকার
অজিত রায়ের নির্ভীক ইতিহাসচর্চা
ধানবাদ ইতিবৃত্ত
ফার্মা কে এল এম ❑ ৭৫ টাকা

প্রভাত চৌধুরীর দুটি কবিতা

❑ পুতুলের সংসার ❑

আমি যে পুতুলের সংসারটিকে চিনি এবং জানি সেই সংসারের কোনো পুতুলের চুল কিন্তু কালো নয়, অথচ আশ্চর্য কেউ পরচুলাও ব্যবহার করে না, ওই সংসারের খিড়কির পুকুর কিংবা আঁতুড়ঘর ঠিক কোন দিকে তাও আমার জানা নেই, তবু আমি অকারণে দাবি করি আমার জানা আছে ওই সংসারের বড়মেয়েটি যখন উল বোনে তখন তার কাঁটা থেকে যে গন্ধ এবং রঙ ছড়িয়ে পড়ে সেই গন্ধে কিংবা রঙে যে সব মৌমাছিদের আসার কথা, তারা আসে না, আসে একদল সমুদ্র উপকূলের গৃহপালিত পায়রা, যাদের আমি গত বুদ্ধপূর্ণিমায় এক নম্বর চ্যানেলে উড়তে দেখেছিলাম, এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা আবশ্যক যে ওই পুতুলের সংসারে, কোনো পায়রার খোপ কিংবা চালি নেই, এখন আমি এই পায়রাদের রাখবো কোথায়, আমি তাদের এক নম্বর চ্যানেলে ফেরৎ দিতে পারি, অথবা অ্যাকশন মুভিজের রক্তহিমকরা কোনো হত্যাদৃশ্যে পাঠিয়ে দিতেও পারি, তবে সেক্ষেত্রে এই পায়রাগুলিকে অবশ্যই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে নিতে হবে, তখন এই বৌদ্ধপায়রাগুলি মৃতদেহগুলিকে তাদের প্রসারিত ডানা দিয়ে আড়াল করতে সমর্থ হবে, সবশেষে জানিয়ে রাখি মৃতদেহগুলি যখন সৎকারের জন্য সরিয়ে নেওয়া হবে, তখন পুতুলের সংসারে যে আত্মভোলা এল এম জি-টি আছে, সে কি কোনো প্রতিশোধ নেবার কথা ভাববে, যদি ভাবে

❑ শীতকাল বিষয়ক রচনা ❑

আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি একটা শীতকালের মধ্যে শুধুমাত্র উলের বল-ই থাকে না, তার মধ্যে একটা বাদামী রঙের নলেনগুড়ের গন্ধও ভেসে বেড়ায়, আর যে কোনো গন্ধ থেকেই আমরা স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারি ১৯৫৮-র একটি আলোকোজ্জ্বল কার্নিভালে, যেখানে আমাদের পরিচিত ব্যান্ডবাদকেরা তাদের টুপিতে গুঁজে রাখে হলুদ পালক, আমরা সেই পালকগুলির জন্য কিছুটা স্পেস ফাঁকা রাখতে পারি, কেননা আমরা ওই পালকগুলি সম্পর্কে সবটা ভালোভাবে জানি না, আর জানি না বলেই এই ছেড়ে রাখা স্পেসের পর আমরা অনায়াসে শুরু করতে পারি এক যাত্রাপথ, চিকাগোগামী সেই নির্জন রাস্তাটিতে পৌঁছে, অথবা ৬ টি পতাকা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা আমাদের জ্যাকেটটিকে আমাদের গাড়ির পেছনের সিটে রেখে আসতে পারি, তবে মনে রাখতে হবে সিটবেল্ট বাঁধার কথা ভুলে গেলে চলবে না, সিটবেল্ট বাঁধা শেষ হলেই আমরা পৌঁছে যাবো নায়াগ্রার নীলরঙের জলের ভিতর, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই আমরা দেখতে পাবো নীলরঙের জল লাল কিংবা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, আমার বিশ্বাস এসবই সম্ভব হয় শীতকাল নামে একটি অতিপ্রিয় ঋতু আছে বলে

❑ সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ❑

চারটি কবিতা

● নাগাল পেরিয়ে

লোকটা
মদ ছেড়ে দিয়েছে—
লোকটা
গান ছেড়ে দিয়েছে—
লোকটা
এখন আর অভিমান করেনা—
লোকটার
এখন কোন বন্ধু নেই—
লোকটার
এখন কোন শত্রু নেই—
লোকটার
কোন মৃত্যুভয় নেই—
লোকটার
জীবনের মায়া নেই—

লোকটাকে
এখন যতই নগ্ন করবে
নিজের নগ্নতাই বাড়বে—

● সুন্দরের মুখ

তোমার
স্তনহীন স্তন
তোমার
যোনিহীন যোনি—
এ ভাবেই সুন্দরের ঘোমটা খোলা মুখ।

● খেলা

খেলা
তুচ্ছ খেলনা নিয়ে খেলা—
কতদিন—
আর কতদিন—
কবে সেই খেলাভাঙার খেলা?

● মিড়

১. সুখ—অর্থাৎ পেতে চাওয়া
দুঃখ—অর্থাৎ না পাওয়া
কিংবা পেয়ে যাওয়া—

২. দিনগুলো রাত হয়ে যাক্
আর জেগে ওঠার কষ্ট থাকবে না—

৩. গান শুনলে মন খারাপ—
গান শুনি, শুনতেই হয়—
মনখারাপ খারাপ লাগে না—

৪. আমার শোকসভায়
যদি হাজির থাকতে পারতুম—

৫. যেদিন তুলনার জন্ম হল—
তুমি আর আমি আলাদা হয়ে গেলাম—

৬. কেন এসেছিলুম ?
কেন ফিরে যাবার কথা ভাবছি ?

শুভঙ্কর দাশ

ছিবড়ি

গাছের ঝিক-পাতা নড়ে গেছে তুমি দেখ চেয়ে চেয়ে
কতটা রশ্মি নিতে পারে ছেলেবেলা
কাঁধেরা জেনেছে এই ঝলকি গোল গোল চাকতির গুঁড়ো
চাঁদ ভেবে ভরসা করেছো, এই রোদ্দুরে এই পাতারা
স্থির গতির কথা ভাবে
আঁকের পাহারাদার জন্ম নেই এইখানে অর্থাৎ মৃত্যুও
থেমে থেমে গেছে আর জনমে আর জনমে আর জনমে
বাকল তোর ঠিকঠাক ট্যোনা মরদের মতো গোঁত খাচ্ছে
এ্যাতটা ঠুনকো যেন টোকা দিলে ঝরে যাবে এ জীবন
মশাই হে ভেঙে ভেঙে ঠুংঠাং দুনিয়াদারের কাছে
জন্মদাতা গান গেয়েছিলো এবং তার ল্যাজ টেনে টেনে
ছুটে আসে খুলে খুলে পড়ে সৌন্দর্য রূপের গরিমা
ধরা যাক তার নীচে কোনো মুখ নেই একদম প্লেন সাদা
যার উপর সিঁদুর চড়াবে বলে ওস্তাদ গয়না মুড়ে আসে
জন্ম সহ্য করো শীত সহ্য করো ক্ষুধা আমাদের
শরীর ঘিরবে বলে আরো লাল মখমল গয়নায় ঝালাপালা ছিলো।

শঙ্করনাথ চক্রবর্তীর তিনটি কবিতা

রেশমপাদুকার অগ্রভাগ ঃ ১৯

রাজা অয়দিপাউসের মত
ভগিনী ও কন্যাকে নিয়ে
শহরের পথ থেকে পথে
যৌবন ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছি

আর সোফোক্লেস যা লেখেন নি,—
আন্তিগোনের গর্ভে কচ্ছপের জন্ম দিয়ে
আমি এবার লিঙ্গচ্ছেদ করবো

কিন্তু পাপ কখনো দর্পণ চেনে না

পট্টমহাদেবীর রাং

মাথায় শিং গজানোর পর এক রাতে চরম সুখস্বপ্নে পাথরের গুঁড়ো এগিয়ে দিয়েছে যম ঃ নচিকেতার দস্যুবৃত্তি পছন্দ-অপছন্দর উর্ধ্বে রাখতে চায় সে ঃ এইসবে রাবণের বক্কলের পতন ঘটলে তার অমরত্ব স্বর্ণব্যাঘ্রের সন্ধানে চিরস্থায়ী কিনা, এই অভিনিবেশ রাঢ়গোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দিয়ে কৃতান্ত নিশ্চিত ?— এই প্রশ্ন সম্ভাব্য হ'য়ে উঠবে কবে !

১৩.৯.৯৮

ক্রন্দসী তুমি যমুনা হয়েছো আজ ঃ
সোপান তোমার রক্তে যে যায় ভেসে ঃ
পটলাঞ্ছিত রজনী শাঙনঘন ঃ
মাতুল সূর্য জাগেন ভোরের শেষে.....

তোমার দু'কূল নোঙরের ঘন ছায়া।
রমণক্লান্ত বাণিজ্যতরণীতে
শ্রোণীনৃত্যের মহড়া ভগ্নপদে
তৈলমশক ফেলবে প্রাকার থেকে

সৈনিকবধূ আস্তিন টেনে ধরে—
শিরস্ত্রাণের দিন শেষ হলো তবে ঃ
গুল্মের দেশে দনের বেতো ঘোড়ার

ছোট গল্প

❑ সুবিমল বসাক ❑

দুয়ে দুয়ে চার

'কাল ইলিশ খেলাম, বাংলাদেশের।'

'কেমন লাগলো? কত করে নিল?

'মন্দ না। বেনফিসের স্টলে—একশো ষাট করে।'

ব্যানার্জীদা এ-ওয়ার্ডের পেশকার, চারহাজার কেস, ইদানিং উপরি চারশো, স্রেফ ইন্টিমেশান বিক্রী করে, তারপরও আছে রিফান্ড ইস্যু, অ্যাপীল এফেক্ট, স্ক্রুটিনি কেস—একশো ষাটের ইলিশ খেতে পারেন বটে। লটারীতে পাওয়া সল্টলেকের ফ্ল্যাটে বাস। বাসস্থানের মাহাত্ম্যও কেমন স্থান নামের উপর নির্ভরশীল, রায়সাহেবের পৈত্রিক ভবন টালিগঞ্জের গাছতলায়—বলার সঙ্গে সঙ্গে টাই-প্যাণ্ট খসে গিয়ে ধুতি-গেঞ্জি বেরিয়ে আসে। ব্যানার্জী-দা'র হাসি গা-মাখা সর্ষে-ইলিশের চকচকানি ঠোঁট তেলতেলে।

আমাদের ঠোঁট শুষ্ক, খরখরে, কোনো লিপ-গার্ডও মসৃণ করতে পারে না। নাজীর, স্ট্যাটিসটিক্স, অ্যাকউন্টস্-এ পোস্টেড কালো তেলের চকচকানি নেই। অপেক্ষা করতে হল-এরিয়ার ডি.এ.র জন্য। দাম সামান্য নীচমুখী, বাজার-মিটারে কয়েক ডিগ্রী, হোক না যতই মাছ আজ নেবো।

কদিন ধরে অনিলের ঝুড়িতে ইলিশ, বড় বড়, পেটি-অলা, বরফ ছাড়া। পারত পক্ষে এড়িয়ে গেছি, অনিলের হাঁক ডাক শুনেও, পদ্মার ইলিশ, দ্যাখেন এর পেট-একেবারে টাট্‌কা, পাশপোর্ট-ভিসা ছাড়াই ইণ্ডিয়ায় এসেছে—ধরা দিতে। অনিলের কথাবার্তায় কুট্টিদের রসিকতা—শেষ রাতের ধরা মাছ এ কি সরকারী গুদামের-বরফ চাপা! আজ একেবারে আলাদা ব্যাপার, হাতের মুঠোয় আমার নম্বরী নোট—এরিয়ারের; ইলিশ নিয়ে যাবোই-যাবো।

ঝুড়িতে শেষ ইলিশ একটা ছিল, দেড়কিলোর কাছাকাছি, ১৪০ দরে প্রায় ২১০। শিবু দাস অতটা নেবে না, কাটা নিলে ১৬০ দরে, তাই প্রতীক্ষা করছিল অন্য কোন খদ্দেরের—আধাআধি নিলে একশ চল্লিশের মধ্যে। চওড়া পেটি-অলা ইলিশ যেমন সুস্বাদু, তেমনি দেখতে সুন্দর। আর ইলিশের ডিম? ডিম তো অনেক মাছেরই হয়, কাৎলা, রুই, ভেটকি-বড় বড় মাছের বেশী বেশী ডিম। খেতে তেমন সুস্বাদু নয়। অথচ ইলিশের ডিম—ভাজা, টক—আহা! স্রেফ মাছের তেল আর ডিম ভাজা, সঙ্গে শুকনো লঙ্কা ভাজা—গরম ভাত সাবড়ে ফেলা যায়। তবে, যে মাছের পেটে ডিম, খেতে তেমন সুস্বাদু হয় না। কুমারী-মাছের স্বাদই অন্যরকম।

হিরো হাণ্ডায় চেপে, আদ্দির পাঞ্জাবী, গলায় সোনার গোট, হাতে টাইটান মনীশ এসে থামে। কি হে অনিল, মাছ কি একটাই আছে? ইলিশের দিকে এক নজর, যেন নির্ম্মীয়মান বহুতল বাড়ি পরখ করে। দু'শো টাকার নোট সহ থলে অনিলের দিকে এগিয়ে দেয়। ওজন করে মাছটা তুলে দে!

অনিল চুপ থাকে। আজ্ঞে, নেবে বলেছে আপনার বন্ধু—। ততক্ষণে শিবু সব্জী বাজার থেকে ফিরে আসে। মাছটা আমি নিচ্ছিরে, তুই আদ্দেক নে।

ঃ না, পুরোটাই আমার দরকার। পুরোটাই আমি নেবো। অনিল মাছটা তুলে দে।

অনিল চুপ থাকে। শিবু বলে ওঠে—মাছটা আমি নেবো বলে ঠিক করেছি, কি হে অনিল, তোমাকে বলে গেছি না? আরেকজন খদ্দেরের জন্য-

ঃ নিস নি কেন? আরেকজন খদ্দেরের আশায় তো বসে থাকতে পারে না। কি হলো অনিল, মাছটা তুলে দিতে বললাম না!

শিবু চোখ ছোট-ছোট করে আঁচ করতে চাইল, ইয়ার্কি নাকি অন্য কিছু, শিবু এদিকে তাকায় না, নাকের পাটা ফুলছে। সতেরো বছরের বন্ধুত্বের একি ব্যবহার! ইলিশ নয়, আমরা তো চুনোপুঁটি, হতভম্ব আমি থলে হাতে করে একপাশে দাঁড়িয়ে। ভিড় একটু-একটু জমেছে, বাজার করতে আসা লোকেরা, ছুটির দিন বলে তাড়া নেই—। কথা-কাটাকাটির মধ্যে দেখি, অনিলের ঝুড়ি থেকে মনীশ নিজেই তুলে নেয় মাছটা। তারপরে শুনতে পাই শিবু দাসের গলা, খুব যে টাকার গরম দেখাচ্ছিস? মনীশের গলা একটু উচুঁ, ডাঁট দেখানো—টাকা আছে গরম দেখাবো না! শিবু যেন ভয়ানক ক্ষেপে গেল, রাগ অপমান বিব্রত ভাব, হুঁ, বকেয়া টাকাটা তাহলে পেমেন্ট করছিস না কেন?

ঃ কিসের টাকা?

ঃ কেন, দেড়শো টাকা—এখনও শোধ করিস নি। ভুলে গেছিস!

মনীশ একটু দমে যায়। আশপাশ দেখে সামলে নেয় এক মুহূর্তে, ভিড় জমে উঠেছে, সকলের চোখেমুখে বিস্ময়ের সঙ্গে, মজা উপভোগ করার ঝলক।

মাছ নিয়ে হীরো-হন্ডায় স্টার্ট। যেতে যেতে বলে—ঠিক আছে, সন্ধ্যের সময় পাঠিয়ে দিস কাউকে—। শিবু ঠোঁট কামড়ে অপসৃয়মান হিরোর দিকে চেয়ে রইল। অনিল পাথর। আমাকে আবার দুরে অন্যবাজারে ছুটতে হবে। তবুও কিছুক্ষন দাড়িয়ে আঁচ করার চেষ্টা। সকলেই এর-ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করছে, দুজনেই বন্ধু, একই দলবাজী করে। কি এমন ঘটল আজ!

দশবছর আগেও মনীশ, শিবু—বেকার দুই বন্ধু, রেলওয়ে গুমটির চাতালে বসে বিড়ি ফুঁকত। কেউ থেকেও কাজ জোটাতে পারেনি, কর্ম্মমুখী কাজের দৌলতে শ্রমিক বৃদ্ধি, সেই শ্রমিক হবে হাতিয়ার। ধুস্সালা! দু বছর কম্পাউন্ডারী, অলটারনেটিভ মেডিসিনের সার্টিফিকেট নিয়ে শিবু বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিল—মা তারা নার্সিং হোম। তিনখানা ঘর—পার্টিশান দিয়ে পাঁচখানা কেবিন। ছ বছরে রমরমা, দূরদূরান্ত থেকে রোগিনীরা আসে মাসীমার বাড়ি পিসীমার বাড়ি, তিনদিন থেকে ফিরে যায় বর্দ্ধমান, রেজিনগর, গুসকরা, কাঁকিনাড়া, ডায়মন্ডহারবার বহাল তবিয়তে। স্বাভাবিক অ্যাবোর্ট ছাড়াও, যন্ত্রণা-কষ্ট বিহীন সাকশান-এর বন্দোবস্ত আছে।

মনীশ প্রায় একই সময়ে শুরু করেছিল ছাই-ঘেঁষ সাপ্লাই। ইট, বালি, পাকুড় থেকে স্টোনচীপস্। মাথার ওপর ছাতার বিশাল ব্যাপ্তি, পুকুর ভরাট, রাস্তা মেরামতি, ড্রেণ সারাই, পীচ ঢালা, ঠিকেদারী। থামতে হয়নি আর। চেহারা খুলে গেল, পাল্টে গেল চালচলন, অফিস ঘর, টেলিফোন, সেলুলার। সেকেন্ড হ্যান্ড কার। বৌ রীনা মার্কেটিঙে যায়, বিউটি পার্লারে যায়, সাড়ি-গয়না, দক্ষিণেশ্বর, টিভি-সিডি—রাত্রে স্বামী স্ত্রী হুইস্কী, কাম-কর্ম্মের রাত্রে রাম। মফঃস্বল থেকে আনিয়েছে ঝি, ঘরের যাবতীয় কাজ সে-ই করে।

সূচনা হয়েছিল গোপনে, চোখঠারা, ছোঁক-ছোঁক, খুচরো কিছু কিছু, শালিখ চড়ুই, —পরিপূর্নতা লাভ করে রীনার বিয়ে বাড়িতে অ্যাটেন্ড করার পর। চারদিন থেকে যায়

চন্দননগরে, বিত্তবৈভব গয়না-অলঙ্কার দেখাতে ব্যস্ত তখন। রাম নিয়ে বসে মনীশ রাত্রে, নেশার পর কামনা-কাতর, রীনার অভাবে মালতীকে টেনে নেয়। কাজের সময় অন্য ব্যাপারে মন দেওয়ার অভ্যেস নেই বলে মনীশ কোন সাবধানতার ব্যবস্থাই নেয়নি। দুমাসের মধ্যে মালতী টের পেতে, মনীশকে টের পাওয়াতে পাগলের মত অবস্থা। পরমবন্ধু শিবুর শরণাপন্ন হয় বাধ্য হয়েই। শুনে শিবু হাসে, চিন্তার কারণ নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে। বলেই নাভির নীচে আলতো ঘুষি জমিয়ে দেয়।

রীনা বৌদিমনির কাছ থেকে চারদিনের ছুটি নিয়ে এক সকালে বেরিয়ে পড়ে, মালতী-মাসীর মেয়ের বিয়ে। হাতে ব্যাগ—সাড়ি শায়া ব্লাউজ ব্রেসিয়ার, রীনার দেয়া নগদ টাকা। মনীশ তাকে টেনে তুলে দেবে বলে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, ফিরে এসে চা খাবে। সবে ফার্স্ট লোকাল গেছে ভোর পাঁচটায়।

মাসীর বাড়ি এল মালতী, মা-তারা নার্সিং হোমে। অসূর্যম্পর্শা। তিনদিন পর ফিরে এল মাসীর বাড়ি থেকে। রীনা শুনল, মাসতুতো বোন পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে পালিয়েছে আর কি! তিনদিনের খাওয়া থাকার খরচ বাবদ টাকাটা শিবুকে পেমেন্ট করে দিল। অ্যাবোর্টের খরচ পরে দেবে। শিবু আর চায়নি, ভেবেছে পরে সুযোগ মত দেবে।

হন্ডা ভেতরে ঢুকিয়ে মনীশ কিছুক্ষণ ভাবে, ব্যাপারটা সম্ভবতঃ ভাল করেনি, কেন যে হঠাৎ রাগ হয়ে গেল। থলে শুদ্ধ মাছ এক ধারে রেখে ফ্যানের তলায় বসল। অ্যাকাউন্টেন্ট চ্যাটার্জী সাহেবের মেয়ে-জামাই এসেছে জব্বলপুর থেকে। অনেক টাকার বিল পড়ে আছে। ধানাই পানাই, অবজেকশন তুলছে। পাঁচ প্লাস পাঁচ, দশ পার্সেন্টি বাঁধা। ফল্স্ বিলের আধাআধি। দোতলা ঘরের মোজায়েক করে দিয়েছে, দেয়ালে ডিসটেম্পার। তবুও ধানাই-পানাই, খাঁই মেটে না। অনিলের ওখানে মাছ দেখেই মনে পড়ে গেছিল সহসা, দেখি দিয়ে—। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। ঘরের এক ধার ধরে মালতী জল-ন্যাতায় মুছে আসছে মেজে। হাটুতে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে। মনীশের দৃষ্টি পড়তেই কান গরম হয়ে উঠল, নিতম্বের ঢেউ, সেই সঙ্গে ঝোলা স্তন। অমন অবস্থায় কতবার...ইচ্ছে হলো এখন কষে একটা লাথি ঝাড়তে। তোর বৌদিমনি কোথায় রে?

মালতী ঘুরে বসে। ঠোঁট কামড়ে বলে—পূজোর ঘরে।

অন্য সময়ে, এই সুযোগে কিছু খুচরো খেলা অনুমোদিত ছিল। মালতীর ব্লাউজের তলার বোতাম খোলা দেখেও সে থম মেরে বসে রইল। মালতী দু-একবার ঘরে হাটাহাঁটি করে, ঈষৎ কোমর দুলিয়ে, দাদাবাবুর তৎপরতার অভাব দেখল—আর সে দাঁড়াল না। মনীশ চেয়ারে শরীর এলিয়ে চোখ বুঝে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে হিরো নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চ্যাটার্জী সাহেব বাড়িতে নেই, মিসেস চাটার্জীর হাতে থলে দিয়ে বলল—ধরুন বৌদি। একটু দেরী হয়ে গেল। সাহেবকে বলবেন পরে দেখা করবো। হাসি আকর্নবিস্তৃত।

সন্ধ্যের মধ্যেই অনেকের মুখ চাওয়া-চাওয়ি। বৃত্তান্ত জানার জন্য অনেকেই তৎপর, অথচ সেন্সারড; তা স্বত্ত্বেও চাপা কন্ঠস্বর—আশ্চর্য একই পার্টির লোক হয়ে রাস্তার মাঝে এ ধরনের ঘটনা। জনসাধারনের মধ্যে অবধারিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। পার্টির সুনাম নষ্ট হবে। ধরে নিলাম, কিছু ঘটেছে—কিন্তু তার জন্য এভাবে রাস্তায়, ওপেন রোডে—না, না এসব বাড়তে দেয়া উচিৎ নয়। বুঝতে পারছ না, অপনেন্ট পার্টিরা হুইসপ্যারিং

চালাবে। তোমাদের মধ্যে যা-ই হোক না কেন, বাড়তে দেয়া উচিৎ নয়। পরে যে কি ভয়ংকর প্রভাব পড়তে পারে ভেবে দেখেছো? অ্যামিকেবল মিউচুয়াল করে নাও, নইলে তোমাদের সমূহ ক্ষতি।

আলাদা-আলাদা করে বলা হয় শিবুকে, মনীশকে।

তিনদিন অতিক্রান্ত, কোন তৎপরতা দেখা যায় না। দুজনেই আলাদা-আলাদা খোপে, কে আগে এগোবে! ঘেঁষ-মাটি-সিমেন্ট-ইট-বালি নিয়ে মনীশ যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, শিবুর উল্টো-পাল্টা ফিসফিসানিতে চিড় ধরতে পারে। এতদিনের বন্ধুত্ব, এত অন্তরঙ্গ—চাউর হলে ঠিকেদারীতেও ফাটল ধরা স্বাভাবিক। আর শিবু হিসেব ছকে—এর পরে মনীশ চাঁছাছোলা ভাষায় বলে বেড়াবে—নার্সিং হোম না ছাই। অ্যাবরশন করা ছাড়া আর কিছু হয় না। দাদারা এ-ব্যাপারে মিটিং করবে বলে তোড়জোড় নিচ্ছে।

রাতের বেলা হিরো হন্ডা এসে থামলো হোমে। আয়, ভেতরে। জীনসের হিপপকেট থেকে পার্স বার করে দেড়শ টাকা গুণে শিবুর দিকে এগিয়ে দিল। মনীশ বলল—এই নে তোর বাকী টাকা।

মনীশের চোখ স্থির, শক্ত; শিবু টাকাটা ড্রয়ারে ফেলে বলে—বোস।

কার্বাড থেকে বোতল আর দুটো গেলাস বার করে টেবিলের ওপর রাখে। মনীশ বাধা দেয়—না, খাবো না! তোর টাকা ফেরৎ দিতে এসেছি, যাচ্ছি।

শিবু খপ্ করে ওর হাত ধরে ফেলে। বোস্ খেতে-খেতে কথা হবে।

এ সময় নাসিংহোম বন্ধ। তিনটে কেবিনে তিনজন পেশেন্ট, রেসটে আছে। শিবু দরজা বন্ধ করে দেয় ভেতরের। খেতে খেতে কথা, কেন যে রাগ হওয়া, চ্যাটার্জী শুয়োরের-বাচ্ছা বিল আটকে রেখেছে, গোটা ইলিশ দিয়ে কিছু সুরাহা—চুমুক দিতে-দিতে বলে এসব কথা। তিন রাউন্ডের পর মেজাজ হাল্কা হতে মনীশ বলে—তোকে ইচ্ছে করেই দেড়শ কম দিয়েছিলাম। কেন জানিস— ?

ঃ কেন? শিবু গেলাসে চুমুক দিয়ে, সিগারেট টানে। ধোঁয়া মুখের সামনে রিং-এ ভাসতে থাকে।

ঃ মালতীকে একদিন পর অ্যাবোর্ট করেছিলি। ও ফিরে এসে বলেছিল, সেদিন দুপুরে আর রাত্রে তুই দু-বার—

ঃ ইয়েস! একেবারে ট্রু-ফ্যাক্ট। নেক্স ডে অ্যাবোর্ট করতেই হতো—তার আগে দু-একবার ইউজ—মালতী বলেছে বুঝি?

আবার বোতলের ছিপি খোলা, জল ঢালা, চুমুক, আবার চুমুক—সিগারেটের ধোঁয়া। মনীশ উঠে দাঁড়ায়, এবার বাড়ি ফিরতে হবে, ড্রয়ার থেকে শিবু টাকাটা বার করে ওকে দিতে গেলেই মনীশ—না, টাকা ফেরৎ আমি নেবো না। এবার সত্যি সত্যি তোর সঙ্গে ঝগড়া করব। কখ্খনো না, নে-ভা-র—

কে দিচ্ছে তোকে? ওটা মালতীর প্রাপ্য—দিয়ে দিস। শিবুর এ-কথায় মনীশ হাসে। ক-ম যা-স্ না, তুই। টাকাটা এখন রাখ, যার টাকা তার হাতেই দিস। দুপুরের দিকে মালতীকে পাঠিয়ে দেব। চোখ মেরে মনীশ ফিচেল হাসি হাসে।

অনিন্দ্য সিন্‌হা

প্রবাসে, দৈবের বশে....

ওখানে আমরা নির্জনতা খুঁজতাম, এখানে নির্জনতা আমাদের খুঁজে নেয়।
প্রবাসে দৈবের বশে
ভয়ানক অগ্নিপিণ্ডের মধ্যে সুরকে হিলহিলে শিখায় নাচতে দেখা যায়
ঝর্ণা খার খেয়ে ঝাঁপ দেয় ওপর থেকে
জঙ্গলে অভ্রের পথ
যে দিগন্তে গ্যাছে তার চেয়ে কাছাকাছি শ্লেটে ঝুঁকে পড়ি
কোন নারী দেখছে না জেগে আমার ব্যক্তিগত শয়নভঙ্গিমা
তাই ঘুমিয়ে পড়তে পারি ওগো অভ্রপথ
পাখিটা নেচে নেচে দেখছে ঘুড়িগ্যালারী বাতান্দোলি
পোড় খাওয়া রোদ্দুরে, আকাশে ভেসে উঠল নয়ন
পক্ষীবিষ্ঠা ও জল খেয়ে ভেসে উঠল আকাশে নয়ন
তৃতীয় শ্রেণীকক্ষে কোন সৌরযৌনব্যাসার্ধ্য আঁকা হল না
ছোট ছোট পদচিহ্ন নেচে উঠছে গাছেদের ঘন্টায়

সুর আর ক্যামেরা ডাস্টবিন বিনে বস্তা কাঁধে ঘুরল ভরদুপুর
ট্রাইবালে ভরে গ্যাছে বিডন স্ট্রীট দেখে
দ্রুত ঘুরিয়ে দিল যানবাহন কংক্রীটফাটলে
বাঁশির মধ্যে ঢুকে ঝড় বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় অবারিতদ্বার হোস্টেল গালিচা
তোমাতে তুফান তোমাতেই অর্ফিয়ুস, দয়ানদীতীরে

এখানে পাখি ডাকে পিউবিক গাছে সারারাত
মনে হয় গতসন্ধ্যার দিগন্ত কাঁপানো সূর্যাস্ত অসত্য ছিল
তখন দৈবাৎ আইসক্রীম ফ্যাক্টরীর গোলাপি বরফে হাত ফেলি
দেখি Snowly parambulating down an avenue

আমায় ক্ষমা কোরো হে ঝোল লেগে থাকা কলাপাতা
আমার তৃতীয় নয়নে জয়বাংলা হয়েছে
অথবা হয়েছিল, এখন সেরে গ্যাছে
এখন এইতো ঢেঁকুর তুলে পান মুখে পুরে তোমাদের চোখের ওপারে
লেগে থাকা রেটিনাকাজল জলে ডোবা সুরগুলিকে বুদ্বুদহেনে
ছড়িয়ে দিচ্ছে সূর্যরশ্মিপথে

ওখানে আমরা বৈশল্যকরণী খুঁজতাম। এখানে বিশাল কারণ আমাদের খুঁজে নেয়
দিশেরগড়, ২৫.৬.৯৮

সুকুমার চৌধুরীর তিনটি কবিতা

প্রিয় রনজিৎ

হতাশা হোলেই হাহুতাশ নয় কিন্তু
এসব চিন্তার কিছু নয় রনজিৎ।
ঠাণ্ডা বিয়ার খাও
দ্যাখো মাগ, কিংফিশারের ফেনা
ভেজ পকোড়ার তুক, শান্ত ডালমুট

টুপি পরোনা কেন
তোমার বিরল কেশ, রাগ
খুব গরম এ বছর নাগপুরে
পিচরাস্তা ফুরিয়ে আসছে ক্রমশঃ
সর্বত্র সিমেন্ট রোড তাও
খুংখার হোয়ে আছে রোদ্দুরে
অত ভেবে কি হবে ভাই
তুমি কি 'খনন' কোরে বিশ্বজয়ের কথা ভেবেছিলে

আবিশ্ব সখ্যতা নিয়ে অমিত আজো
হাসাহাসি করে
দ্যাখো লা হুরির পর্যাপ্তমিররে
একটা দুটো অজস্র রনজিৎ
একটা দুটো সহস্র সুকুমার
নিজেকে এতো একা ভাবো কেন। সিগারেট নেবে,
নাও

চলো দুজনে মিলে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করি ফের
একটা পাহাড় বানাই
সমুদ্র
চলো 'খনন' করি।

২২.৫.৯৮

রনজিৎকে আবার

চাগাড় দিয়ে ওঠে
ভাগাড় ভরা নরম

নরম কাদায় আদল
মাদল বাজে প্রেমের

প্রেমের মতো নরম কিছু ভাঙি
শ্মশানঘাটে একলা বসে কাঁদি

২৩.৬.৯৮

রনজিৎকে আবার আবার

এভাবেই হয়। হোয়ে যায়

শুধু কিছু রক্ত যায়
ঘাম ও দহন।

লেগে থাকি।
রক্ত ঢালি
ঘাম ও ধাগুন

অন্য কিছু ভাবি না।
জানি
এভাবেই হয়। হোয়ে যায়

২৬.৬.৯৮

তিমির দেব

অঙ্গীকার

তুমি আমার সব নিয়েছো—
নাও
আকাশ আমার, ঘাসটা আমার
এই নদীটাও
থাক্

আর দিয়ে যাও পুঁতির মতো
বর্ণমালা—অসময়ের কাজ,
তোমার জন্যে ভাবনা আমার—
তাও

তুমি আমার সব নিয়েছো—
নাও

নিবন্ধ

অজিত রায়

কবিতা ও কবির যাপন

মানুষ আত্ম-অন্বেষু। মানুষ নিজেকে খোঁজে নিজের মধ্যে। সেই প্রাক্-আলোযুগ থেকে মানুষের এই আত্ম-অন্বেষণ। মানুষ নিজেকে খুঁজে আসছে বিশ্বজাগতিক টোটালিটিতে। গোড়া থেকেই মানুষ ভয়ানকভাবে কসমোসেন্ট্রিক। মূলত বিশ্বচরাচরের চিরবিস্ময়কে ভর করে তার নিজেকে খোঁজা। সেই তার নিজেকে আঁকা, নিজেকে গড়া, নিজেকে লিপিবদ্ধ করা। সেই তার কবিতা। সেই তার বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকার অবলম্বন।

কবি কে? -অবিচ্ছিন্ন রেকমা থেকে অনবচ্ছিন্ন রেকমার দিকে যার অনিবার যাত্রা। এই প্রেক্ষিতে, মানুষের নিজেকে খোঁজার রেকমাই 'কবিত্ব'। মানুষের কবিত্ব তার অন্বেষক সত্তার পরিসর। কবি 'হতে-চাওয়া'র প্রেক্ষিতে তার কবিতা, সেই তার 'বেঁচে থাকা'। হতে চাওয়ার সদিচ্ছ তাড়নায় কবি নিজেকে ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক ও নির্জনতাপ্রিয় করে তোলেন। তখন সেই কবির সংসারে থেকেও না থাকা। কবিরা ঋষির মত, আত্মমুখ। আত্মিক আবিষ্কারকে বিশ্বচরাচরে মেলে ধরতে চায়।

কবির মাধ্যম শব্দ। আধুনিক কবিতা লেখা হয় শব্দ দিয়ে, ভাব দিয়ে নয়। কবিতা শব্দের অর্কেস্ট্রা, ভাষার যাদু। আর, শব্দ যেহেতু আর্থসামাজিক তলানির শেওলা সুতরাং কবিতায় কবির সময় ও পরিপাশ ব্যঞ্জিত হয়ে উঠে আসে। শব্দের এলাকা খুব একটা ছোট নয়। দৈনন্দিন হাসি-কান্না থেকে শুরু করে মুখর বাগ্মিতা, আর বেশ্যাপট্টির করুণ মোলভাও থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক এরিনা পর্যন্ত এলায়িত এই শব্দজাল। ভালো কবিতায় সব ক'টি শব্দ কথা বলে। ভালো কবিতার জন্ম কবির শব্দশরব্যতা, কল্পনা, মনন আর প্রকাশক্ষমতা নির্ভর। রকম-রকমের সম্পর্কে, ভাববৈদগ্ধ্যের অনুভূতিতে নিমজ্জিত থাকে কবিতার শব্দেরা। ভালো কবিতার প্রতিটি শব্দ মন্ত্রপুত। ভালো কবিতায় নিছক ভোলাভালা স্টাইলে কথা লেখা হয়, ব্যাঁকাত্যাড়া পথ ভালো কবির নয়। কবিতার 'ন্যায়' সেখানে জবাবদিহি চায়। সেই ভয় থেকে ভালো কবির গাঁথুনি যুক্ত নয়। শব্দে এমন এক কলাশক্তি রয়েছে, বা আমাদের কৃত্রিম গাঁথুনিকে নাড়িয়ে দিতে পারে। শব্দের এই বিশেষ ধর্ম বা গুণ শুধুমাত্র মহৎ কবির অন্তর্দৃষ্টিতে উজ্জ্বল। লোর্কা যাকে বলেছে 'দুয়েঁদে'।

যে কোনো উৎকৃষ্ট শিল্পমাধ্যমের মতই ভালো কবিতা কবির অস্তিত্বকে পাঠকের সামনে হাজির করে। তা পঠনপাঠনের রেয়াজ করায় না, টিচারি করে না, ভালো কবিতা আমাদের জ্ঞান বা ধারণার ভাণ্ডারকে বিস্তৃত করে না—তা আমাদের অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের চৌহদ্দিকে এলায়িত করে দেয়। আমাদের অস্তিত্বের আয়াম-বিস্তার অর্থাৎ আমাদের নিয়তির অভিজ্ঞান। বিশ্বচরাচরে যেখানে যা কিছু, কবিতার শব্দজাদুতে সমস্ত অস্তিত্বমান বস্তুর অন্তর্নিহিত আত্মার সঙ্গে পাঠকের মোলাকাত ঘটে। আমাদের দেহ, আমাদের আত্মা, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের মৃত্যু — সমস্ত ভালো কবিতার মধ্যে থাকে। মাটির প্রতি কুমোরের, কাঠের প্রতি কাঠুরিয়ার যে মমত্ব ও নিষ্ঠা, ঠিক তেমনি, ভাল কবিতায় শব্দের প্রতি বিনম্র ও শান্ত অথচ নিষ্ঠাময় অনুরাগ থিকথিক করে। আমরা তা প্রত্যক্ষ করি।

যে কারনে আমি গদ্য-পুজারী হয়েও, বারবার মনে হয়েছে, একমাত্র কবিতাই মানুষের সবচেয়ে বড় নৈসর্গিক ও পুরাতন মাধ্যম — অভিব্যক্তির। মানুষের আত্ম-অন্বেষা আর বেঁচে থাকবার জন্যে এ এক অতি জরুরী আসবাব। আমি যতদূর পরীক্ষা করেছি, কবিতার জন্ম একধরনের 'আবেগমুখী', 'পরিপ্রকাশমুখী' প্রেরণা থেকে সম্ভব। বানানো বা কৃত্রিম শব্দসজ্জার কবিতার শরীর আলগা হয়ে ঝুলে থাকে। এই আবেগ বা প্রকাশতাড়না সচরাচর ঘটে না। তার জন্যে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি, ভাব ও আবেগ-সহ-স্মৃতি কাঠামো অত্যন্ত জরুরী। এই আবেগ বস্তুতপক্ষে বিশ্ব বা সমষ্টির আবেগের সঙ্গে সবিশেষ সম্পর্কায়িত। অনুভূতি বা সংবেদনার সাথে ভাবচেতনা বিজড়িত হবার পর যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয় কল্পনা ও মননে, তাকেই ফোঁটা ফোঁটা করে কলমের ডগায় চুঁইয়ে দিলে ভালো কবিতার জন্ম। আমার মনে হয় এরজন্যে কবিকে সাময়িক বা মাঝেমধ্যে নির্জনবাসে, নৈঃশব্দে বাস করতে হয়। ভাল কবিতার জন্ম যে নির্জনতায় সম্ভব, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জীবনানন্দ।

কবিতা ও তার শৈলী আমার সমগ্র সত্তাকে আন্দোলিত করে। মন, হৃদয়, স্বপ্ন, কামনা, স্মৃতি—সমস্তকে। কবিতা সৃষ্টির সময়, এমনকি ভালো কবিতা পড়ার সময় আমার সত্তার প্রতিটি অংশ স্ব-স্ব গভীরতায় একে-অপরকে স্পর্শ ও প্রত্যক্ষ করে। ঐ অবস্থায়, তখন, আমার সৃজনক্ষমতা বা সৃজনতাড়না আমার সত্তার গভীরে ভয়ংকর ভাবে সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ দ্যোতনা সৃষ্টি করে। চেতনা ও আবেগের এই চিত্রশালায় শব্দ এসে পর্দা টেনে ধরে আর সৃষ্টির নৃত্য শুরু হয়ে যায়।

আমি বুঝছি না ঠিক মতো বোঝাতে পারছি কিনা কিন্তু আমার কাছে কবিতা লেখা এরকম একটা বিড়ম্বনা বৈ কিছু না। মাধ্যমকেই তখন মনে হয় উদ্দেশ্য। বলা যাক, আমার কাছে এই বিড়ম্বনারই একটি অনিবার্য অংশ কবিতা। যাকে আমরা শৈলী বলছি তা হয়ত কবিতার সেই অংশ যা সময় ও অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জুড়ে থাকে। সময় বলতে আমি মিন্ করছি কবিতা-লেখার সেই ব্রাহ্মমুহূর্তটুকু, যখন কবিতা সময় ও তন্মধ্যে নিবদ্ধ কাব্যদৃষ্টির মাঝে কোনো ফারাক থাকে না।

আদিতে শব্দ ছিল, শব্দের সঙ্গেই সময়ের পথচলা শুরু। কেন না শব্দ ছাড়া সময়ের কোনো আভাস মেলে না। শব্দ এতদিন নিজের মত করে জীবন যাপন করেছে। শব্দ শুধু সময় বা তার নিরবধি বয়ে চলাকে, কিম্বা প্রেম ও তার পীড়া বা আনন্দকে সৃজিত করেনি, —অধিকিন্তু মৃত্যু ও তার ভব্যতাকেও শব্দ নিজস্ব তুলিকায় সৃষ্টি করেছে, চিত্রার্পিত করেছে। শব্দ আমাদের সাগরম্বরা ধারয়ত্রিঃ যাবতীয় রোদ্দুরে সুন্দরতা আর সম্ভাবনাকে আমাদের রেকাবিতে এনে সাজিয়ে রেখেছে। এ শব্দের মৃত্যু নেই। জনৈক চিনা সম্রাট পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থকে পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন, মৃত্যুর ছায়া হাজার সালমান রুশদির পেছুতে অনিবার ধাওয়া করে যেতে পারে — কিন্তু একবার যা লেখা হয়ে গেছে, সেই শব্দ মেটানো সহজ বা সম্ভব নয়। সম্ভব যদি হয়, তাহলে বাতাস-চুরির গল্পটাও সত্যি। থাক সে কথা।

তবে অন্যত্রও যেভাবে বলেছি, শব্দ মাত্রেই নিষ্ক্রিয়। তার নিজস্বক্ষমতা লোপাট। শব্দ-শূন্য, তা ভরাট হবার অপেক্ষায়। জেনারেল মানুষের শব্দব্যামো থাকে না। সেখানে শব্দের আচরণ খানিকটা ভূতের মত। সাধারন মানুষের শব্দ ভূতবিলাসী। কবির শব্দ ভবিষ্যবিলাসী। কবি নির্ভার ও শূন্য ভুতুড়ে শব্দকে ভরাট, ওজনদার আর মানুষ করে গাঁথেন। কবির শব্দ-গাঁথনি ভাব-প্ররোচিত ও মাপজোকবাহী। কবিই একমাত্র এহেন মাথাপাগল কাজে বিশ্বাসী। কবি শব্দকে যুৎ করে গাঁথেন, যাতে কবিতায় শব্দ ভাষার

হাত থেকে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে থাকে। সময়ের হাত থেকে এগিয়ে থাকা, ভাষাকে সময় থেকে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে বা ঠেলে দেওয়াই শব্দজীবী ওরফে কবির অপ্রত্যক্ষ কাজ। কবির শব্দ পাঠককে চেনাতে সাহায্য করে দৈনন্দিন যাপন ও বেঁচে থাকা। যে-কারনে পলাশপুরের কবির কবিতা পলিতাপুরের ট্রামলাইনে ছোটে। হুই লে লে বাতাস লগরেছে !.....

যে কারনে কবি নিজের কবিতা যতবার লেখেন আরো আরো ততবার নতুন করে কবিতা লেখার কাজে তিনি যত্নশীল হয়ে ওঠেন। ধাপে-ধাপে পরতে-পরতে কবি নিজেকে কবিতায় খোঁজেন, আবিষ্কার করেন, গড়েন, ভাঙেন, আবার গড়েন—এভাবে কবিতা কবির কাছে এক নিরন্তর বেঁচে থাকা। এভাবে ভাবলে, কবিমাত্রই লোগোসেণ্ট্রিক। কবিকে তার বয়স, অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 'ক্রমশ', ভেঙে-ভেঙে, থেকে-থেকে, ধাপে-ধাপে, একটু-একটু করে শেষে সম্পূর্ণ রূপে পাই। একজন কবির কবিতা সুতারাং ধারাবাহী পাঠের সদিচ্ছা জাহির করে।

কবিমাত্রেই প্রতিষ্ঠান ও স্বা-বিরোধী। যেহেতু কবিমাত্রেই অভিনবত্বের মাঝি। সেই নতুন বা অভিনবত্ব আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁর শব্দশরব্যতায়, শব্দসংগঠনে, বয়নে, উপমায়, প্রতীকে, রূপকে, চিত্রকল্পে, কাঠামোয়। অসীমকে সসীম করে তোলার জেদ ও আগ্রহ কবিকে নিরন্তর স্বা-বিরোধী করে রাখে। যেহেতু প্রতিষ্ঠান বা স্বা যৌনপ্রাবল্য ও উত্থিত লিঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র মৌলবাদী। ভাষাবদলের কবিতাই আসল জীবিত কবিতা। বাদবাকি সমস্ত শব্দঘোঁট। জীবিত কবি মৃত বা হিজড়ে ব'নতে গরস্বীকার। প্রয়োজনবোধে তিনি নিজের উত্থিত লিঙ্গের আগুন ও ধার পরখ করে নেন। তখন ফের হেই লাগ্-লাগ বাতাস শানাও !

৪.৮.৯৮

অজিতের এ আলোচনা সুচিন্তিত হলেও বহু প্রাজ্ঞজন এর সঙ্গে একমত হবেননা। কবিতা নিয়ে প্লেটো থেকে কর্লাইল এবং আধুনিক কালের পণ্ডিত ও কবিরা কেউই ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি, পারার কথাও নয়। কবিতা কি, কেন, কিভাবে লেখা উচিৎ এসব খুবই অস্বস্তিকর বিষয়। এ পত্রের অদৃশ্য সম্পাদক এ আলোচনার সঙ্গে একমত না হলেও লেখাটি নিজগুনেই এখানে অন্তর্গত। এ বিষয়ে আমরা বিদগ্ধ আলোচনা আরো আশা করছি। —প্রকাশক

আশির দশককে চিহ্নিত করেছিল যে বহুআলোচ্য উপদ্রুত কাব্যগ্রন্থ ঃ

নিরোর বেহালা

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

অনার্য সাহিত্য ❑ ৬টাকা

এখনো সামান্য কপি অবশিষ্ট ❑ বইটি পেতে প্রকাশককে লিখুন।

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

রাত্রিমাতা

কাঁচের বিকারে শুয়ে
ঈশ্বরের সাথে গল্প করে হিমায়িত ভ্রুণ;
আঁধার আলোক নেই, প্রজ্ঞা শিল্প নেই
কালোত্তীর্ণ দুই প্রাণ, মেধার ওপার......

❑

কোথাও যাবার কথা ছিলনা মানুষের;
মানুষ তো লক্ষ্যহীন, অপ্রতিম বর্ণচ্ছটা যেন,
ঋণাত্মক শক্তিনৃত্যে উল্লসিত চৈতন্য-বীজ—
তবুও মানুষ যায়; সময় জানতে যায় বিষুবরেখায়,
বিদ্যুৎ-চৌম্বক ঢেউয়ে ভাসমান দেবযান, তাও দেখতে যায়,
দেখতে যায় ব্রহ্মাস্ত্র উৎপাদন গুহা,
জীবন্ত কঙ্কালের প্রেত প্রদর্শন,
চকোলেট খায়, ব্যাধির আগার দেখে
—এসব তারই কীর্তিমালা, সব দেখে
আর জ্যোতিহীন বিশ্রম্ভালাপে আপ্লুত হয়.....

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি—উষ্ণিক ছন্দের মতো বৃষ্টি সারারাত,
তবু স্নান নেই, স্নান নেই মানুষের বহুকাল,
কেবল বাণিজ্য, তত্ত্ব, বর্ণ ও বিবাহ এসব অজৈব ধাঁধা
আত্মার দূষণ।
শূন্য সময়ে চোরাস্রোত বহে চলে আমাদের গভীরে,
কোকিল পক্ষীদল গায়, আমরা বুঝিনা
আর ঋষির জীবন্ত অনুভব একরাশ গৈরিক মেখে
অবোধ্য পড়ে থাকে মহার্ঘ পুঁথিতে,
একদিন দাম্ভিকের অস্ত্র হবে বলে।

❑

মনের ভূগর্বে নীল, মায়ানীল সান্দ্র সরোবর জলে
ভাসে সাদাহাঁস
পদ্মের মৃণালে বুক ঘষে কিশোরী মাছ—
মৃণাল, শুরু যার অনন্ত নাভিমূলে, শেষ যার অনুমান-নির্ভর,
লুপ্ত চিদাকাশ—
উদ্ভিদদল ঘনবদ্ধ, বাক্য বিনিময় করে
সে সংলাপ আমরা বুঝিনা,
মাঝে মাঝে বুদ্‌বুদ্ ওঠে চেতন আকাশে
আমরা চমকে উঠি,
সেই মৃণাল, তার মূলদেশ নিয়ে ধ্যান যজ্ঞ হয়, তর্ক হয়

তবু অস্পৃশ্য থেকে যায় শব্দের বস্তু রূপান্তর—
ভাবের অদ্ভুত রামধনু দৃষ্ট হয় শক্তি-প্রেক্ষাগৃহে

❑

....তখন শিশিরসিক্ত গমক্ষেতে অসম্বৃত শুয়ে থাকে
রাত্রিকুমারী, স্বর্ণমেঘপ্রভা।
সিন্দুর রাগরঞ্জিত তার অন্তস্থল থেকে উঠে আসে প্রহেলিকা,
আসক্ত আহ্বান আর রিরংসার তীব্র রাগে ছিঁড়ে যায়
মসলিন, জ্যোৎস্নার—
'রক্ত দাও, বীজ দাও! পৃথিবীর মৃত্যুযোগ জেনে
রতিযজ্ঞে ঋত্বিক হয়েছি আমি।'
মাটির গভীরে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে শিলাস্তর, তরল আগুন
আর ঋষিকন্যা গেয়ে ওঠে রাত্রিসূক্ত।
'মহাকাল, হে আমার অনন্ত পৌরুষ, রাত্রির ঋতুরক্ষা করো।'
রাত্রি, মহারাত্রি তুমি অনলব্ধ, অনন্ত যৌবনা
আমাদের পাপতাপশোক নিয়ে তুমি সৃষ্টিকে
আয়ুষ্মতী করো।

ঘুম ভাঙে আমাদের, সুক্তির নির্মোক ছেঁড়ে,
মুছে যায় প্রাচীরের ছায়া—
সারাগায়ে মাটি মেখে মানুষ ও শৃগাল,
তোমার নিতম্বপূর্ণতায় স্মৃতি চাটি;
উরসিজ বেয়ে নামে পুণ্যতোয়া
আমাদের শৌচস্নান হবে—
উরসিজ, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী তোমার, পদ্মগন্ধ মধু।
অলকানন্দা চাইনা আমাদের, অলকানন্দা দেবতারা নিক,
নিয়ে নিক পারিজাত, উর্বশী-সঙ্গম
আমাদের সাথে তুমি থাকো, থাকো তুমি আমাদের
নির্মাণ এষণায়, থাকো তুমি মৃৎপাত্রে গহন প্রজ্ঞায়।
তোমার মমতা নিয়ে, স্বপ্ন সান্নিধ্য নিয়ে
আমাদের বেঁচে থাকা, জেগে থাকা আতপ্ত সন্ধ্যায়...

❑

ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে নিশাচর,
চণ্ডাল শব ঘিরে শুরু হয় মরণ-উল্লাস—
বিজ্ঞানীর আলোকিত ছবি ধীরে ধীরে কালো হয়,
শ্বাদন্তে ছিঁড়ে যায় জরায়ুর ফুল।
মস্তিষ্কে লাঙল দিয়ে অজৈব রসায়ণ যোগে চাষ হয়
ব্যাপক ক্যাকটাস,
নীল-হলুদ ফুলের ক্যাকটাস মানুষকে গোরিলা করে
যে গোরিলা রঙচ্যুত, স্নেহশূন্য, পুত্রকন্যাহীন
যার শিশ্ন রতি নয়, শুক্র উৎপাদক

যার যোনি রসহীন, রাতহীন, অণ্ডআগার।
কাপালিক বিজ্ঞানীর চোখে পাতা নেই
সূর্য তার শক্তির উৎস শুধু, আয়নিত অন্ধকার

❑

সূত্রের সংলাপে মুছে যায় সৌন্দর্য ভক্তিগান
অনুপ্রাশ বাড়ে শুধু খর দ্বিপ্রহরে,
শ্রমিকের প্রয়োজন বলে পরীক্ষাগারে একই অনু থেকে
সৃষ্ট হয় সহস্র যমজ — খর্বকায়, হীনবুদ্ধি, পেশীর বাহার।
মেধা নয়, বুদ্ধি নয়, মননের তীক্ষ্ণতা নয়,
যা প্রয়োজন তা উৎপাদন, তা ভোগ,
তা সে আনবিক চুল্লিই হোক, শ্রমজীবি হিজড়া হোক
অথবা মোমগাত্র বিকিনি প্রচুর.....

মানুষ বেদনা চায়না আর, চায়না অপেক্ষার রাত, অনশন,
উপবাস অথবা যন্ত্রনার লীন লঘুতাপ—
কেবল সুখ দাও ওকে, নরম সমতল সুখ আর চিন্তাহীনতা।
জিজ্ঞাসা আর নেই কোন পৃথিবীতে আমার,
প্রশ্ন নেই—নেই বলে আত্মহত্যা নেই, সাধনা-সংযম নেই,
নেই বিদ্রোহ-উত্তাপ—যা আছে তা কেবল ভেসে যাওয়া,
ঈশ্বর-শয়তান ফে'লে কাব্য ও ছবিকে উৎসন্নে দিয়ে
প্রেম ও বিবেককে ধ্বস্ত ক'রে এ এক শবাসনা সুখ—
প্রশ্নপূর্ব উত্তরের, ক্ষুধাপূর্ব আহারের এই ব্রতহীন সুখে
ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে মানুষীতনয়—
আর ঘোররূপা ডাকিনীর বিকট হাসিতে ক্ষয়ে যাচ্ছে
মরুর বরফ, ওজোনের স্তর ছিঁড়ে পৃথিবীতে ঢুকে পড়ছে
লোহিত বামন পাপ....

❑

এই সুখ ত্যাগ করা চাই,
ভাঙা চাই এই মোহ, অসত্য আচার,
বরং রাত হোক নিদ্রাহীন আমাদের, তারাদের দিকে চেয়ে
আমাদের জন্মনষ্ট হোক;
দুলুক প্রশ্নচিহ্ন, রক্ত পুঁজ ঘেঁটে আমাদের উপলব্ধি হোক।

ক্ষুধা থাক, গর্ভবতী স্বৈরিণীর সামনে বসে থাক চিত্রকর
তবু 'সূর্যমুখী' হোক—
অস্উইচ্, ট্রেব্লিংকা আছে জানি,
আছে বলে মানুষেরও প্রতিরোধ আছে,
নোবেলের শান্তি আছে, বিবেক-দংশন আছে, আছে পেত্রা কেলি।
জীবাণুও আছে জানি, জানি আছে শরীরের নিজস্ব প্রহার;

ব্যভিচার অত্যাচার আছে, আছে বলে নচিকেতা পুত্র তুমি
সংকল্প জানো,
দুর্যোগের অন্তর ছিঁড়ে তুলে আনো জীবন কুসুম...

❑

যান্ত্রিক শান্তি নয়, ভিক্ষুক, প্রলয় আমরা চাই—
তমসার প্লাবন চাই, অতিস্থির অনুহৃদয়ের ঝড়
আমরা তো জানি;
সেই দ্বন্দ্ব আমরাও চাই, চাই ইলেক্ট্রন বিচ্ছুরণ
কোয়ান্টাম ঝড় আর নতুন আকাশ...

ভুলে যাও শান্তি স্থিরতা, ভোলো ওগো মানুষ নবীন,
মেনে নাও অভিব্যক্তি, বিস্ফোরণ; অশ্বদল প্রস্তুত করো
পরবর্তী সৃষ্টি নাদে মানুষের নবজন্ম হবে,
মিউজিয়ামে ঝুলে থাকবে বিংশ শতকের ছবি, ভয়েজার,
অসহায় হোমো-সেপিয়েনস্.....

❑

চারুহাসিনী, পরিশুদ্ধ রাত্রিমাতা তুমি
রতিযজ্ঞ শেষে দৃষদ্বতী তীরে জন্ম দিয়েছ আজ নতুন মানুষ—
ওরা ভ্রষ্ট ভোগবাদী নয়, নয় শূন্যবাদী শুষ্ক দার্শনিক।
প্রেমনীল চোখ তাহাদের ছেঁড়ে, ভাঙে, ছন্নছাড়া হয়
খুঁজে ফেরে মাংস বৃক্ষ জলে অমৃত আধার,
জ্যোতির্ময় হয়....

শৃঙ্গারসাক্ষী দলিত ভূমি ও ওষধি আলস্য সুপ্তিতে হাসে,
অদ্ভুত ভোরে আজ বস্তু থেকে প্রাণের উন্মেষ হলো
পরিপূর্ণ মানবাত্মা ওরা সামঞ্জস্যময়,
ওরাই ভোরের উদ্‌গাতা, উষার তনয়,
আলোময় ধ্বনিময় প্রাণ—
জীবনকে বুকে নিয়ে স্থিতির ভ্রান্তি ভেঙে
তাহাদের নতুন আচার।
মৃত্যু বার্ধক্য জরা, স্বর্গ ও নরক, ইতিহাস হয়ে গেল সব
চেতনার উচ্চশাখে সৃষ্টি সব একদেহ, বিভিন্ন আকার

❑

হিমায়িত ভ্রূণ নয়
কাঁচের বিকার ভেঙে উড়ে যায় আগুনের পাখি

শুভব্রত চক্রবর্তী

মৎস্যপুরাণের দৃশ্যগুলি

১. এসো ঋদ্ধ হও, এসো সঙ্গীত
তোমার চোখের নিচে মসৃন পালকেরা, এখন
ডানা ভেঙে শব্দের মূর্ছনায় ফেরে

২. ডানা থেকে খসে যাচ্ছে দিন, রাত্রি
শবের দিকে যার যাত্রা,
দিনলিপি থেকে হীনজন্ম উঠে আসছে

৩. তাদের ক্ষমা করোনা তুমি;
সভ্যতার গভীর কামনায়
কোনো ব্যাবিলনের মুখোমুখি
অসফল নায়িকারা পড়েছে কাফকার ডায়রি......

৪. তুমিই কি প্রকৃত সত্যবতী
আমিষ গন্ধের ভিতর সালঙ্কারা,
লোভাতুর অচেনা বেশ্যার ব্রত

শেষপ্রহর
যেখানে যৌনমূর্তির নিচে স্বপ্নের সুড়ঙ্গ নেই

৫. আলো নেই, অন্ধকারও নেই
প্রদীপের আলো ঘিরে শুধু মাংসের প্রেতযোনি
একটানা কান্না, লোল চর্মময়....
তাহলে শয়তানের আসন কোথায় বসাবে

৬. ফুর্তি করবে, গেলাসে গেলাস ঠুকে
বলবে 'মৃত ঈশ্বরীর স্বাস্থ্য কামনায়......'

আমাদের নরক যে মৎস্যকন্যারই গর্ভে

৭. তোমার হৃদয় শূন্য করে গান হলো
শরীরের বিনিময়ে রাজস্ব
সেখানে অমাতিথি মুখ খোলে কামিনীকাঞ্চনে

৮. প্রলাপ ঃ ভালোবাসা
নির্জন ঘরের দিকে বৃদ্ধের যৌনলোভ, আসলে

৯. এক নরকঋতুর আকাঙ্খায় কেটেছে বাসর

১০. আজ তাকে দেখবো
সেই সুড়ঙ্গ ভেদ করে মহাতীর্থ
অদৃশ্য সুতোয় বোনা জন্মের পোশাকে

১১. অথবা শরীরের আদলে তৈরী হচ্ছে মুখোশ

১২. সত্য, সত্যবতী হারালে দাসবংশ, মর্যাদা....
তুমি সদ্য যুবতী
দাসদাসী, আহার্য, কামুক পুরুষ সব তোমার জন্য

রাজমহিষী খেতাব

১৩. মাতৃপূজা শেষ হলে
উড়ে আসে সন্ততির সিংহাসন

১৪. শান্তি নেই তবু, কেবল শ্রান্তি
স্মৃতির রেখাচিত্রে যারা ফেলে গেলো তোমায়
আজ নিশ্চুপ তারা

১৫. যত ভয় বাড়ে, প্রত্যাশার অতীত
জেগে ওঠো তীব্র,
রূপ ও রূপোয়

১৬. পুড়ে যাচ্ছে আমার পিঠ
মোমের শতাব্দী জুড়ে গরম নিঃশ্বাস
আমি মুছে গেলে
কিছু বুদ্‌বুদ্ অবশিষ্ট থাকবে

১৭. স্বপ্নসঞ্চারে
নক্ষত্র আলোয় পরী নামে, তখন

১৮. অন্য পুরুষেরা এলো বিগ্রহ জাগাতে;
কোনো নির্জনতায়
জীর্ণ বিস্তারে ভেসে ভেসে

১৯. বাতাস বইছে উল্টো দিকে
এবং শতাব্দীর মুখ, অভ্যাসজনিত স্বপ্নতত্ত্ব
যা দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গের কারণ

২০. বহুদূর
রাত্রিশোভন পুকুরের জ্যোৎস্নায়
শিকারীরা বদলে যাচ্ছে অপরূপ মেঘে

২১. কখনো কাফকার পাঠশালায়

২২. আবার মহাজাগতিক বৃক্ষেরা পুড়ে গেলে
ইতিহাস থেকে তাঁবুর মনু-সংহিতায়

২৩. এসব হচ্ছে। আমি
অবিকল দেখছি
অথচ তুমি অন্ধ

২৪. জ্যোৎস্না শিবিরে এইমাত্র ঢুকে গেলো
যে মেয়েটি, আমাদের কেউ নয়;
তবু হাত রাখি উন্মুখ হরিণের নুনে
তার উদর গ্রন্থিতে
অস্তিত্বের অতিচেতনে ছড়িয়ে পড়ছে কস্তুরীনাভি
পাশাপাশি শীতল ইন্দ্রিয়ের খোঁজ রাখি নি

২৫. ফিরে আসে অলঙ্কার। বৃষ্টিশীৎকার
অস্থির স্পন্দনে রেশম সৌন্দর্য
স্পর্শের প্রেম
একইসাথে অবদূত ও লম্পটের জেগেছিল দৃষ্টিক্ষুধা

২৬. তোমাকে পেয়েছি মুখোশ পোশাকের পর!
কখনই তুমি নও......

২৭. অবতার! অগ্নি নেই
এখন ছায়া আর ত্বক ভস্ম দর্পনে মিশেছে
দীর্ঘ বর্ষা সেচনে সেহেতু হিন্দুকুলনারী
ঈশ্বরেই প্রণত হয়

২৮. নিজস্ব কিছুই নেই,
পেছনে রয়েছে দ্যুতি
ভগবৎ
অলীক দূরত্বে ফেরে, যদি

২৯. রাতচিহ্ন ক্ষীণ হয়ে আসে
রতিচিহ্ন মুগ্ধ হয়ে আসে
উন্মাদ আয়নায়

৩০. এ ছাড়া নিস্কৃতি কোথায়, শরীরসর্বস্ব

৩১. তুমি ফিরে এসো। আমি
বসে আছি চিরকাল অন্ধকারেই
শুধু ডানা-দুটি ক্রমশ ছেঁটে দিচ্ছি সেই মৎস্যপুরাণে

৩২. অতি আলোময়। অন্য এক নিশ্চল নির্মাণ
মহাযাত্রা পথে উড়ে আসছে ভ্রমণ পাখির দল
তুমিও উড়ছো, তবে পরী দেহে

ব্যক্তিগত গদ্য, চিঠিও

তমিস্রাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূসর শব্দের মনোলগ

এই সেই হতাশাজনিত উদ্বেগের চাঁদ, যা স্বয়ংক্রিয় তাই মনোলোভা, তার ধূসর শব্দের মনোলগ আহা জানেমন্, মেঘের মত ডানা পাক। হাঁসের মত উড়ে যাক সন্নিকট ছেড়ে।

আমি বলি আমার মুগ্ধতার কথা।

''যাক যা হচ্ছিলো'', বলে প্রত্নতাত্ত্বিক কাক উড়ে যাচ্ছিলো দক্ষিণের দিকে। বাধ্যতামূলক বানিজ্যবায়ুতে চেপে চলে গ্যালো নিরালম্ব পশ্চিমে। তার এই সরে যাওয়া, তার এই destination কে পারোয়া না করার উদ্ধত্যে প্রকাশ পায় দেবদূতীয় লক্ষণ। আর আমার ঘুম পায়। স্বপ্ন পায়। আর প্রত্যেকটা স্বপ্নের পেছনে হড়হড়ে রংয়ের বালতি নিয়ে ছোটে লোপামুদ্রা নক্ষত্র, ছোটে নক্ষত্রমালা। আহা, ঝিনচাক colourful হয়ে যায় আমার কষ্টকর অতীত, আমার স্বা-বিরোধী বর্তমান, আমার.....আমার জীর্ন শব্দময় ভবিষ্যত।

শ্রীধরদা, এই ভাবে ধীরে ধীরে গদ্যটা তৈরী হচ্ছে। follow করো। আর কিছু করার নেই। অনন্যোপায় হয়েই স্বাবলকিত চেতনার অসহায়তাকে প্রশ্রয় দিলাম।

চোখের সামনে মৃত্যুদিনগুলো এক এক করে বদলে যায়। বিসদৃশ জাগতিক গ্যালভানাইজড তারগুলোর সংগে জড়িয়ে যায় ক্রীড়নক টর্চ ও হৃদয়। মাথা বাড়ে। কেবলমাত্র মাঝে মাঝে বিপদসীমা পার হলেই হুড়ুমতাল চিৎকারে ভরিয়ে দিই systematic রাজপথ, সংকেতপ্রবণ জেব্রা ক্রসিং, আকাশ ও চরাচর মধ্যবর্ত্তী (—) শোয়ানো রেখায় সিলুয়েট হয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে আমার লিংগসর্বস্ব soul, noble sole মাঝে মাঝে স্নায়ুগুলো পচা ব্লাডারের মত deformed ফুলে ওঠে। ৬৪ ভূতের খেয়ায় চেপে মন পাড়ি দিতে চায় শ্রীবৃন্দাবন। চায় অখণ্ডিত মৃত্যু। রোজ রাতে radio fm বিদূষী হাঁসের মত প্যাঁক প্যাঁক করে। ''কাল সকালে জানলা খুলো, তোমার জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করবে'' স্বপ্নহীন রাত কাটিয়ে ভোরবেলা জানলা খুলতেই কেউ আমার মুখে অতর্কিতে এক দলা রোদ ছুঁড়ে দেয়। চোঁয়া ঢেঁকুরের মত টক টক ঝাঁঝ। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

বড় কষ্টে-সিষ্টে বেঁচে আছি হে। একটা হাস্যকর বর্ণহীন জামার ভেতরে ঢুকে নিজের নীল শরীরটা বাধ্যতামূলক সাইজ করার চেষ্টা করছি। বড় আঁট হয়ে আছে। কোনো relief পাচ্ছি না। দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই দ্যাখো আমার চোখের কোণে জল। এই দ্যাখো আমার কপাল, হাত দিয়ে দ্যাখো আমার কপালে, কিচকিচ করছে ধুলো শব্দের বালি। এই দ্যাখো আমার ৬৩ কিলো ওজনের শরীরটা খরগোসের মত তিরতির করে কাঁপছে। ছুঁয়ে দ্যাখো। আমি ভাল নেই। ভাল নেই।

আমি বলি আমার যৌনতার কথা।

আমার যৌনতা প্রকাশ পায় ঠিক সাড়ে সাতটায়। শৃংখলিত অজস্র নভ-জোনাকির নিঃসাড় বোঝাপড়ার মধ্যে রঙবাজী দেখা গোলাকার চাঁদ। গুটকা খেতে গিয়ে হঠাৎ গলা তুলতেই চোখের ওপর হামলে পড়ে নক্ষত্র-চাঁদোয়। লাভার মত গায়ে, চটচটে অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ হতে থাকে, ভোররাত অবধি। যাবতীয় হরকৎ তখন আমার চিহ্নিত হয়ে পাপাচার বলে। একটু বেগড়বাঁই পদচারনার মাঝে barrier হয়ে দাঁড়ায় ঘুণ ধরা যন্ত্র-মানুষের লোহার খাঁচা। অথচ আমি আমার ছুঁড়ে দেওয়া অসহায়তা লুফে নেবার জন্য পাইনা খুঁজে কোনো পদ্ম-হাত। আমাকে পাইপ দিয়ে পেটাতে থাকে অঢেল সময়। আমি খুব সহজেই, বা একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমার চোখের পাতা ভারী করে দ্যায় ''নিয়ম-শহরের'' অসহ্য রাত।

দক্ষ পকেটমারের মত ব্লেড চালায় আমার কাজে। আমি...আমি.....

তোমার আগের চিঠিটার উত্তর দিইনি। কেন দিইনি? ওঃ! আসলে তার পরেই তো কলকাতায় গেলাম। তাই। আর? এবার বল ওস্তাদ, খবর কি? আমি তো আবার জুতে গেছি কাজে। দিব্যি আছি। ''খাও-দাও-কালবাজাও, দিনের বেলা যথার্থ কামাও'' ফর্মুলায় কোনো খত্‌রা নেই জেনে সেঁটে যাবার ধান্দায়। সার বুঝেছি, initially একটু problem আছে গুরু। তবে স্যাট্ স্যাট্ করে এদিক কেটে ওদিক কেটে আলোর মত যদি চিরে বেরিয়ে যেতে পারো কমরেড! তবে আর পায় কে।

জয় বাবা রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার গুরু। আরে চল মন আমার, চল বাবা, আমি কেনারা বরাবর, এই দ্যাখো দৃশ্য, এই দ্যাখো অসংখ্য তালসারির মাঝে বেচারা দুর্বল শশী, হাতের গার্ডে জ্বালিয়ে নিতে চেষ্টা করছে দেশলাই, মুখে Birds Eye সিগারেট, ওই দ্যাখো সেই অতল খাদ, সর্বনাশা কালো নিশির মত সটান টেনে নেয় যতসব prehistoric মানুষের জানেজা, ওই দ্যাখো সেই কল্প-প্ল্যাকার্ড যার বাটাম ধরলেই অনুভূত হয় গভীর চাপ, চল মন আমার। চল বাবা ঘুরে আসি জম্মু তক্, invoice এর ওপর লিখে দেবো ভ্রমনকাহিনী, চক্ষুষ্মান হোক ভদ্রমণ্ডলী, মন আমার, চল ছুটে চল সেই নির্মাল্য অবধি, যাকে ছুঁতে আমার ইচ্ছা হয়, প্রবল কামনায় টনটনে হয় নাগরিক ত্বক, মন আমার চল।

আমি বলি আমার শরীর খারাপের কথা।

''এসো শরীর, বসো শরীর, তুমিই তো সক্রাতা হে, আমরা তো আমজনতা। তুমি যাহা বুঝাইবে, আমরা তাহাই বুঝিব। এই নাও ডাস্টার, চক, মাঝে মধ্যে পেটাবার জন্য camlin-এর কাঠের স্কেল। এই নাও ব্ল্যাকবোর্ড, register, পড়া না পারলে গাঁট্টা মেরো, চিমটি কেটো, ডাস্টার দিয়ে হাল্কা ঠুকে দিতেই পারো, তবে দোহাই বাবা চোখ কানা করে দিও না, কিম্ভূত organ ওটা''

ডায়ালগ শেষ।

কাটা রেকর্ডের মতন organ শব্দের ওপর চাকতি বেমক্কা ঘুরছে। ঘরের ভেতর ধুনকি মেরে আছে একক-যুবক, প্রায়ান্দকারে cooler চলছে, মোহন পরিপাটি পরিবেশে Jim Morrison—এর Buffelo Soldier শুনতে শুনতে পিনিক নিচ্ছে রবিবারের মধ্যদুপুর,

একক-যুবক মাঝে মাঝে হার্মোনিকা হাতে তুলে নিচ্ছে, মাঝে মাঝে কলম, মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেখে নিচ্ছে কে কোথায় আছে, কে কি অবস্থায় আছে, আর মনে মনে কষে নিচ্ছে গেরিলা যুদ্ধের প্রকরণ। শিখে নিচ্ছে এসপারান্তো ভাষাভাষিদের মধ্যে থেকে অন্য এক মানব সংকেত। আর অবসরে স্বপ্ন দেখছে ডন কিহোটের মত অলস ঘোড়ার পিঠে চেপে সে এগিয়ে যাচ্ছে আমোদগেঁড়ে রোদের মধ্যে দিয়ে। পেছনে স্যাংকো হয়ে আসছে....আসছে..... ধুর শালা, কেউই আসছে না, আসছে মনিকা, মনিকা ওহ্ মাই ডার্লিং।

ভালো থেকো। live and let live চিঠির উত্তর দিও। তোমাদের চিঠি পেতে ভাল লাগে। বউ, মেয়ে কেমন আছে? মেয়েকে মাঝে মাঝে পড়া দেখাচ্ছো তো? দেখো বাবা! বাধ্যতামূলক পানাহার চলছে!

আমি ভাল আছি। অথবা ভাল নেই।

ভালবাসা জেনো।

৮.৬.৯৮

নয়া দিল্লি

শ্রীধর মুখোপাধ্যায় প্রকৃত অর্থেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখক। তাঁর বইগুলি বছরের সব সময় পাওয়া যায়।

গ্রাফিত্তির বই ঘরে

(২এ টিপু সুলতান রোড, কলিকাতা ২৬)

ও

অনার্য সাহিত্যের ঠিকানায়

সলিল চক্রবর্তী

মেঘলা

আকাশ যেখানে মেঘেভরা সেখানে আমার গ্রাম।
আকাশ যেখানে কেষ্টকালী লাল ও হলুদে আলো—
সেখানে আমার গ্রাম। থানপুকুর, ঠাকুরবাড়ির
পুকুরে, গাছের ছয়লাপ, হাঁস, পানকৌড়ি
ডাকপাখির মিলমিশ সংসার। সেখানে আমার গ্রাম।

পথ চলে গেছে ধুলো মেখে—
শরীরে নিকষ গরুর গাড়ির চাকা।
বনঝাল, ভাঁট, ওকড়ার—হাতভর্তি ঝাউ
জিউলি, আমড়া, বেল, অশ্বত্থ, বট, কুলগাছের
সারি সারি—সুন্দরবনের গেঁয়ো, গরাণ ও
সুঁদুরির মতো ঢালসবুজ।

মন্দিরটা, বাঁশবনের পাতার আদর খাচ্ছে
একটুদূরে অন্নপূর্ণা ঠাকুরবাড়ি থেকে
ভেসে আসছে ওঁকার ধ্বনি।
পাড়ার শিবুদা, খালিপায়ে
বৃষ্টির মধ্যেই তরতর এগিয়ে যাচ্ছেন—
ছাগলছানা, চড়ুইপাখি কাটিয়ে কাটিয়ে
'বসন পর মা বসন পর মা
বসন পর মা পর
বসন পর মা'।
বাড়ির সামনে বদ্বীপ—পুকুর তিনটে
তিলভরা জল। মাছঠাসা।
ব্যায়ামাগার ও বাবাঠাকুরের থান।
হালদারবাড়ির সামনে
পেঁচো ও পাঁচির পুজো হচ্ছে। তালগাছের নিচে।
খেঁজুর, বাতাসা, বীরখন্ডি, মুড়কি, কদমা, পাটালি
উঁকি দিচ্ছে, বারকোশে।
সধবা মেয়েরা, বুড়ি ও কচিকাঁচারা ঘিরে
রয়েছে চাদ্দিক।
নাপিতপাড়ার ছেলেরা ছিরকুট ঘুরে
বেড়াচ্ছে, শীতের দুপুরবেলায়।
প্রসাদ খেয়ে—ঘুড়ি ও লাটাই বগলদাবায়

হৈ হৈ সব বন্ধুদের কাছে,
আকাশ নিভে যাওয়ার আগে।

লবঙ্গলতিকা, জুঁই, মাধবীলতার চুমু ভরা
কুটির 'করুণাময়ী'.
পিতৃপুরুষেরই বাসস্থান, নামটা মায়ের।
ক্যান্সারে হারিয়ে যাওয়া, বাবার দুকূল
ছিঁড়ে উঠে আসা অসামান্য কষ্টের নীলিমা।

এখানেই থাকতাম আমি, পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে—
আমার হাতের তালু লাল
পিঙ্গল বর্ণের চোখ
ঠোঁট লম্বা, নখ বেশ চওড়া
কমলা রঙের জিভ, সজ্জিত দাঁত।
মুখমন্ডলের মতো নাক। গৌরবর্ণ।
মুখ বন্ধ করে, হাসা।

অথচ এখন আকাশ দেখি না আমি
ফুল, লতাপাতা, পাখিপক্ষ্ম ও না
থানপুকুর, ঠাকুরবাড়ির পুকুর বা ভাঁটবন
পেন্টিং-এ পেন্টিং-এ।
চড়ুই, কাঠের।
শিবুদার গাওয়া শ্যামাসঙ্গীতের
বদলে, 'দিল তো পাগল হ্যায়—'
লাল রোয়াক থেকে।
এখন আমি বন্ধুদের ঘুড়ি-লাটাইয়ের
জম্পেশ আসর থেকে
সেলুলারে কণ্ঠলগ্ন।
হালদারবাড়ি কিংবা বাবাঠাকুরের
থান থেকে প্রসাদ খাওয়ার
ছোটার থেকেও আরও জোরে
সিঁড়ি ভেঙে চারতলার ঘরে
কমপিউটারে অটো ক্যাড শিখছি,
শিখছি ভিস্যুয়াল বেসিক বা. ডেলফি—

আমার ভিতরে তবু কেউ আজও
ব'সে।—কথা বলে, গান গায়।

মৌলিনাথ বিশ্বাস

মৃত্যু-জন্মগাথা

উৎসর্গঃ ল.সো.

(সঙ্গমের আগে প্রেম পরে কান্না......)

তোমার জীবনে আমার জন্মের আগেই
আমার মৃত্যুকে তুমি রচনা ক'রেছ
মৃত আমি তাই এই মৃত্যুগাথা লিখি
বীজের অক্ষরে, বীজ রক্তে জন্ম নেয়

সেই থেকে আমি আজো মৃত হ'য়ে আছি
পোড়ানো হয়নি শশ্মান পাইনি ব'লে
পোড়ানো হয়নি সময় হয়নি তাই
আমার জীবন শুধু রাবণের চিতা—
কল্যাণ জাভেদ তোমরা সবাই বাঁচো
তোমাদের সাজানো চিতায় শুয়ে আমি
ক্রমশঃ ঝলসে যাচ্ছি পোড়াচ্ছে সময়
এবার আগুন কবে ঝলসাবে দেহ?

আমি ভুলে গেছি আমি মাতৃগর্ভছেঁড়া
আমি ভুলে গেছি আমার বাবার নাম
আমি ভুলে গেছি এই নীহারিকা থেকে
বহুদূরে আরো কত নীহারিকা আছে
যেখানে হয়তো আমি-ই প্রথম মনু
যেখানে হয়তো তুমি আদি নারী হ'তে
যেখানে হয়তো কাল অন্যতর হয়
যেখানে হয়তো কাল স্থির, স্রোত নয়

আমরা দুই-টি শিশু পোশাক পরি না
আমরা দুইটি শিশু বাবা ও মা নেই
মাংসের মতন সূর্য গাছেতে ফল
সেই ফলে জীবনের শাঁস লেগে থাকে
সেই শাঁস মাংসরূপে আমাদের দেহে
সূর্যের শক্তিতে হচ্ছে মানব-মানবী
ভিতরে গোপনে জাগছে প্রথম কামনা

প্রকৃতি বাগানে কোন নিষেধ থাকে না

আমার চোখের সামনে তুমি নারী হ'তে
আমার হাতের স্পর্শে তুমি স্তন পেতে
সেই স্তনে রক্ত পেত আমার সন্তান
আমি লিঙ্গ দিলে তুমি গর্ভবতী হ'তে
তুমি গর্ভ দিলে আমি সন্তান পেতাম!
সময় হারিয়ে যায় থেকে যায় প্রাণ
পরম্পরা এই সময়ের অন্তরালে
সময় সেখানে বাঁধা সময় শৃঙ্খলে!

এখানে শিকল ছিঁড়ে কাল হারিয়েছে
আদিঅন্তহীন আমি বাঁচতে চাই না
তুই কবে স্তন দিবি পুতনা-আক্রোশে
তোমার মলিন স্তন আমি ছিঁড়ে ফেলবো
আমি টেনে নেবো তোর শেষতম প্রাণ
সেই বিষ মুখে আমি অমৃতের ছেলে
অজাত আত্মজ তোকে খুন হ'তে দেখি
জন্মরক্ত লেগে আছে আমার দু-হাতে

মৃত্যু থেকে শুরু ক'রে জন্মলাভ হ'লে
নারীবাস আগে পরে গর্ভবাস হয়
সেই গর্ভ ছিঁড়ে আর বেরনো যায় না
সেই গর্ভে নারী তুমি আমাকে ঢোকাও
সেই গর্ভপথে ছড়ানো রয়েছে গয়া
শিবপুর আর আরবদেশের কাঁটা
মৃত্যুপল ছিঁড়ে দিচ্ছে নগ্ন তপ্ত বালি
দেহ পুড়ছে পুড়ে যাচ্ছে মেধা কাম কাল

তোমার জীবনে আমার জন্মের আগেই
আমার মৃত্যুকে তুমি রচনা ক'রেছ
মৃত আমি তাই এই মৃত্যুগাথা লিখে
আমার জীবন থেকে কাল মুছে দিলাম!

অমলেন্দু বিশ্বাস

মহাগ্রহ, তুমি আলো ফেলো

গনেশের কলা বউয়ের মত নুয়ে পড়ছে ভবিষ্যৎ !

নীহারিকাপুঞ্জ থেকে ইন্টারনেটে জানাল দ্রষ্টা;

কীভাবে প্রস্তর যুগ তিনভাগ জলের প্রদেশে
বিলুপ্ত রয়েছে দ্যাখো। প্রত্ন চোখে দেখে ফেলি আরো
জঙ্গল সভ্যতা ব্যাপ্ত করে দিচ্ছে আমাদের মানবজমিন।

পৃথিবীতে পাথর ও জল শুধু ভূগর্ভে বিলীন !
আর বাকীসব প্রানীকুল জঙ্গল কবলে।

যদিও রয়েছে কিছু পতিত জমিন। মহাগ্রহ—
তুমি আলো ফেলো মানবজমিনে পতিত জঙ্গলে;

উর্দ্ধরেত থেকে আলো, অসম্ভব মন্ত্র রাঙা আলো—
ফেলো ভবিষ্যৎ চোখে, চৈতন্যের পতিত জমিতে !

রাজা দাস

উত্থান

এই স্বীকারোক্তি পর কিছুটা পেট্রল রাখা আছে
এই বিরতির পর অনেকটা ভেদবমি রাখা আছে
বিপথে গেছি বলে কি শপথ ভুলে গেছি
গলার নীচে শৈলশহর এখনো নীলগানের ভূমি

জাহাজ চমকায় ঘাটে ঘাটে, ট্রাফিক সিগন্যালে 100 C.C
যেভাবেই রাস্তা হই বা ক্যানো এই পলায়ন
সমুদ্রচুক্তি ভঙ্গ করে না নিখাদমীনের সাঁতার
উপরন্তু উজ্জ্বল করে, ব্রণ দ্যায় রক্ত দ্যায়—

ফিরে এসেছি হেলার নীড়ে ডিম দেবো, স্বাদ দেবো অন্যথায় পচা ভ্রূণের সংগে বেসামাল আমি
নখখুঁটে ঝাপসা করি আত্মপথ—ভিখারীর কান্না   বিগব্রোজ থেকে লংশটে পিছলে যায়
ময়দানব

ঘাস পুতে পুতে অরণ্য হয় না মাই বস— নিজের খুলি দিয়ে ফুটবল
খেলে শিক্ষিত হয়েছি অত সহজে অনাথ হতে দেবো না শিশুকে,
নির্জনে, মৃত্যুর মত বাসি কথা ভাবো তুমি গলির অন্ধকার !

ঐ মাঠ হলুদ হবার আগেই ত্যাগ করেছি জুয়ার টেবিল
এখন টেক্কা বিবি গোলাম অংশত অভুক্ত; রিক্ত
বংশের খৈ ঠুকরে খাওয়ার আনন্দ না হয় তোমায়ই দিলাম।
সে এক বিশ্রী সহজাত বিশেষ তাড়না; —ঘেন্না করি, ঘেন্না করি

অশোক দে

বুড়ি ❑ ১

মরিচ রঙা গালি   ঠিক গালি নয়   অনুরূপ তুর্কমান গালি-গালিচা
তার ওপর রোজউড   তার ওপর শিশুর যকৃৎ বর্ণ লোহিত মদ্য
স্ফটিক পানাধার   আপনি তেকোণা শক্ত সেলাইয়ের জামা পরে
আমাদের দিলেন না   আমরা ধসা হেপাটিক
ক্লান্ত মাকড়া যুবক   শিশুর লিভারদ্রব চাই   চাই সেনোটাফ
হাঃ   আপনি আশ্চর্য বদলে দিলেন হিমপুডিং। বিষপুডিং
ছড়িয়ে   স্নায়ুতন্ত্রীতে   এক রৌপাভ ছাইদান   স্মারক
পঞ্চাশের মাঝামাঝি ভস্মবাহী ছিলো ('সে সময় উনি ছিলেন তো !')
হঠাৎ ধাতব শব্দে   বোতলস্থিত লাল তরল ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা
গালিচায়   কেন দিলেন না রুধির মদির !   শুধু ফোঁটা
ফোঁটা ফোঁটা   এই বঞ্চনায় যন্ত্রণার মৃত্যু হবে একদিন   আমাদেরও !

আশির প্রজ্ঞাবান কবি
শুভব্রত চক্রবর্তীর
প্রথম কাব্যগ্রন্থ
বলো বৃক্ষ, পাথরপ্রতিমায়
পঁচিশে বৈশাখের কবিতা ❑ কুড়ি টাকা

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা

কামঠ

সেতুর ওপরে ছিলো বাড়ী
অতলের সাথে জানা শোনা,
বুড়োগাছ নিয়েছে মানত
দু-চার কথায় তবু রাজি।
যদিও তেমন ভাঙাচোরা
হতে পারে যে কোন প্রকার,
ভেবে নিলো ভালো পারমিতা
খামোখা আঙুলে রাখো ছুরি।
প্রহসন কত ভাবে আসে!
নুয়ে পড়া সময় প্রসব,
তোমার ছায়ায় ঢাকো যাকে
ঘোলা জলে ভেসে ওঠা দেহ—
অথবা সবাই জানে সব
রঙ মেখে প্রতিটি মুখোশ,
সেতুর ওপরে তোলে বাড়ী
নীচে পোষে ভয়াল কামঠ।

সংকেত

মালিন্যের মৃত্যু হলে রাধাচূড়া পাঠায় সংকেত
কাপুরুষ রণনীতি, আজ তবে বোধনের ভুল
শিথিল শৈশব আমি ফেলে আসি কৃষ্ণা প্রতিপদে
প্রকাশ্যে কখনও চাঁদ ঝরোখায় স্তিমিত অক্ষর।

জলের অপর নাম তারা যদি বলে গেলো স্মৃতি
মেধা নিয়ে রাত্রিদিন পাশা খেলে পাণ্ডুর সন্তান,
নির্বাসন দিলে কাকে! তথাগত অবজ্ঞায় নীল
শব্দ হতে বহুদূর কোলাহল মুছে দিলো গান

বিবাদ পালন ছিলো জাতিস্মর প্রবলের প্রতি
কঠিন চোখেও তবে অনিমেষ ভেঙেছে পাহাড়।

অমর চক্রবর্তী

অপমান সিরিজ থেকে একটি

যে যে আমাকে অপমান করেছে—সবার কথা মনে আছে

জলের কথা বলবো না — জল তবু জল
বন্যা হলেও। দারিদ্র্য সীমার নীচের মানুষের তবু
বালি খুঁড়েও পরিতৃপ্তি। কিন্তু সেই স্ফটিক পাত্র
তার কথা ভুলবো কি করে। যাকে ছুঁতেই
চেঁচিয়ে উঠেছে আমি অশিক্ষিত, সুন্দরকে ধরতে জানি না
সেই অপমান আমি ভুলবো কি করে?

এবার, নরম সাদা ক্রিমের কথা বলি ঃ
চতুর্দশীরা যা শরীরে মাখে
পূর্ণিমা যা দিয়ে ভেজায় গোপন স্থান
শুধু কালো বলে সে আমার মুখে উঠতে চায়নি
অন্যদের সুন্দরের সার্টিফিকেট দিয়ে
আমাকে করেছে অপমান!

দু'একটা পথও অপমান করেছে আমাকে
যে পথ নদীর দিকে যায়নি, সজনে গাছের ছায়া নেই
সেই পথে হাঁটতে গিয়ে দেখি সংকুচিত প্রাকৃত দৃশ্য
শুধু সাইরেন বাজিয়ে ছুটছে মন্ত্রী আমলা
আমাকে ধাক্কা মেরে, আমি আমজনতা অস্পৃশ্য!

এবার প্রেমের কথা, স্তনের কথা
যার জন্য আমার অফিস ছুটি, ভাল জামাকাপড়
সেভেন ও' ক্লক শেভিং। যে দিন সেজেগুজে যাই
আঁচল সরাই—দেখি তীব্র উদ্ধত আলো
অন্য কোন স্বপ্নে চেয়ে আছে দূরে......
আমার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে।

যে যে আমাকে অপমান করেছে—সবার কথা মনে আছে।

বৃন্দাবন দাস
মিডিয়া

সাহিত্য,
ওর কাছে অম্ল-প্লীহা;

ওর, আত্মীয় কটুম্ব
আর কাঠ লোহা করাত
সঙ্গে
কিছু পা-ধরা শ্রম-দরদী
আধা-মজুরে কেজো রমনী
সমান;

উৎসব,
পানীয় আর
পান-পাত্র হাতে আধো-বোজা
চোখ;

ওর
উন্নতি, একটা পেজার ফোন
আর কিছু বয়স্ক চাটুকার,
অভাবী বন্ধুকে ছুঁড়ে দেয়
খুচরো চাঁদি আর
ঘৃণার দূরত্ব;

যানবাহিত বন্ধু,
ওর রক্তের শোধনাগার;

ওর, রাজ-বন্ধু
খুঁজতে থাকে — মহৎ ভূমিকা।

বাংলা কবিতাকে অন্যতর মাত্রা দেয় যে
কাব্যগ্রন্থ
সালভাদোর দালির নীল
শ্রীধর মুখোপাধ্যায়
কবিতীর্থ ❑ ২০ টাকা

কাব্যপরিক্রমা

শুভব্রত চক্রবর্তী
অলীক মাত্রায় বেজে উঠতে পারে

সারারাত হিমযুগ স্বপ্নের গভীর সুড়ঙ্গ অতিক্রমণে পৌছে যাই উষা লগ্নের বাস্তবে। যে সূর্যকিরণ ইন্দ্রিয় স্বত্তার, স্পষ্ট নির্মাণের, দৃশ্যের অথবা বাতিল করতে করতে কিভাবে দৃশ্যান্তরে এগিয়ে যেতে হয়—এই শিক্ষার অথচ প্রতিফলিত পরাবাস্তবে, ক্রমাগত ভ্রমণের নিরাবারণ, রহস্যের পায়ে মায়াকানন উঠে আসে। আর অন্ধকারেই শেষ, অন্ধকারে অন্তহীন। কল্পরাত্রির চেতনায় যা একাধিক অস্তিত্ব নিয়ে বারবার ফিরে আসে সেই শূন্য, বিষাদমগ্ন, অমাতিথি সুড়ঙ্গের ভিতরে।

এভাবেই বলা যেতে পারে শঙ্করনাথ চক্রবর্তীর কবিতার অন্তর্লোক প্রসঙ্গে। কবি ঐতিহ্যের, কবি সমসময়ের কোনোটাই অস্বীকার করা যায় না। আবার এ কথাও সত্য চেতন-অবচেতনের সীমারেখা ছাড়িয়ে একমাত্র কবিই ভাঙেন ইতিহাস, সময়ের গতানুগতিক সংস্কার। এ এক অনির্দিষ্ট, ব্যতিক্রমী প্রয়াসের আলোয় কবির নিজস্ব প্রতিসরণ; তাই তিনি তৃপ্ত নন, সম্প্রাপ্তও নন, প্রথম পর্বাঙ্গ থেকে শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত—তার অন্বেষণ চিরন্তন। 'কাউন্টের সমাধি' গ্রন্থটির রচয়িতা শঙ্করনাথের উচ্চারণ বেজে ওঠে সেই গভীর তাৎপর্যেই 'এমন সব প্রক্রিয়ায়, যা থেলাসের সময় থেকে সম্প্রতিও/বিকল্পের সন্ধান পায়নি'। বাহ্যিক বিবর্তণের হেতু সময়ের কিছুটা পরিবর্তন হয়ত লক্ষ করা যায় তবে সভ্যতার গভীরে অভাববোধের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যগুলি অবিকৃত থেকে গেছে। ইতিহাস বা পুরাণ পুঁথি থেকে সংবিদিত অপূর্ণতার লক্ষনসমূহ শঙ্করনাথের কাব্যে আধুনিক জীবনের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছে। যা অস্তিত্বের বোধোদয়, অনিশ্চিত সম্মুখে সেই জ্ঞানলব্ধ, প্রাচীন যন্ত্রনার এক রূপান্তরের যাত্রা, ক্রমশ উপলব্ধিতে আসে এবং চরম সত্যের বিশ্বাসে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত চেতনায়। তখন অক্ষর, শব্দ, পংক্তি বিন্যাসেই কবির একমাত্র মুক্তি, অন্ধকারে বিকল্প আলোর সন্ধান ঃ

যেদিকে তাকাই
বারুদের অন্ধকার রোষ ঝ'রে পড়ছে
পিতার ছায়ামূর্তি বাতিদান উল্টে দিয়ে যায়

বিদ্যুতের মহাছোবলের নিচে
ঘর জ্ব'লে উঠছে
তুমি এসো, ঋদ্ধ হও
যাদের আসার কথা ছিল
আমার অন্তর্জলীর রাতেও শান্ত হ'তে পারেনি তারা
পরের মুখ থেকে প্রসব উঠে আসছে

একই কবিতার তিনটি টুক্‌রো। আবার তিনটি কাব্যাংশই সম্পূর্ণতার দাবী রাখে। এভাবেই তিনি রচনা করছেন 'দারুবৃক্ষময়'।

শঙ্করনাথের অন্যমাত্রার নির্মাণ, ভাষাশৈলী সমকালীন কবিতার প্রেক্ষিতে এক স্বতন্ত্র রীতির প্রকাশ—কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কেবল হৃদয় প্রসূত নয়, কবিতা মস্তিষ্কেরও; দুই-এর সঙ্গমেই প্রকৃত কবিতার সৃষ্টি। স্বধর্মের বোধ আর স্বদেশের সংস্কৃতির একইসাথে ঘটালেন ঝকঝকে ভিনদেশী উচ্চারণ, গঠনভঙ্গি ও বিভিন্ন মিথের তাৎপর্যময় অনুসঙ্গের নিখুঁত সংযোগ। সচেতনভাবে নিয়ে এলেন কবিতায় পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাব। ভাষার তির্যক ব্যবহারে অনাবৃত, দৃশ্যমান হয়ে উঠলো অবচেতনের একাধিক স্তর। আসলে কবিতায় দেশ, কাল, সংস্কৃতিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, বিপরীতে তাদের অতিক্রম করে পূর্ণ বিশ্বায়নের রূপ দেওয়ার চেষ্টা আজকের কবিতারই ধর্ম। আর তাই কবিতা স্বাভাবিকভাবেই হারিয়েছে পাঠকের নিজস্ব নির্জনতার দাবী, সমস্ত অস্তিত্বে লক্ষ করি তার মৃদু অথচ গভীর বিচরণ। আধুনিক প্রশিক্ষণ, ধারাবাহিক অনুশীলন ছাড়া এই কবির কবিতার প্রকৃত মর্মগ্রহন একেবারেই অসম্ভব।

'তুমি কি সেইসব রহস্যের কথা জানো! –যা, কখনো জানার উপায় ছিল না, ভ্রান্ত অনুমানেও নয়! একজন নয়, অন্যান্য নামে ছড়িয়ে থাকা, তাদের সর্ববিধ চাতুরি নিয়েও আমাকে জয় করতে পারেনি, বঞ্চনার নামে মধ্যযুগ ছুঁড়ে দিয়েছে, পরিশ্রমী ও অলস হ'তে শিখিয়েছে, আর এমন-এক স্বাধীনতা, তুলে দিয়েছে— যা জর্জনে থেকে বুশার পর্যন্ত সমান দক্ষতায় তুলে নিয়েছি'
—চিতা

প্রায় প্রতিটি কবিতায় দেখি শঙ্করনাথের মেধা, পুঁথিলব্ধ জ্ঞান কি আশ্চর্যভাবে কাজ করে চলেছে। নিজস্ব আবেগে জারিত হয়ে ব্যতিক্রমী রচনারীতি, অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রজ্ঞার ভিতরে কখনই তিনি কবিতার মূল স্পন্দনকে হারিয়ে ফেলেন নি, বরঞ্চ বলতে পারি, প্রজ্ঞা তার কবিতাকে ঋদ্ধ করেছে, কবিতাকে করে তুলেছে যর্থার্থ, সার্থক। প্রাথমিকভাবে হয়ত তাকে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতন শুদ্ধ উচ্চারণের কবি মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়; গভীর মনোনিবেশে বুঝি এভাবেই তিনি অনেককেই স্বীকার এবং অস্বীকার করে নতুন ভাষার কাছে প্রণত— এ কথা আমি আগেই বলেছি, অন্যপ্রসঙ্গে।

প্রথম থেকেই শঙ্করনাথের কবিতার সঙ্গে আমি পরিচিত। যা আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি। পড়েছি তার 'রতিপল্লী', 'র‍্যাবোর দিকে', 'নারঙ্গ, যা নিকেতনমনি' থেকে সর্বশেষ বহু অপেক্ষার পর এই কাব্যগ্রন্থ 'কাউন্টের সামাধি'। প্রায় সমস্ত কাব্যগ্রন্থই পাঠের সুযোগ আমার হয়েছে। আমাদের সময় যাদের সম্ভাবনাময় মনে হয় তাদের মধ্যে অবশ্য শঙ্করনাথ অন্যতম, বিশিষ্ট প্রতীভার অধিকারী। তিনি ক্রমশই ভাষার দুর্বলতা কাটিয়ে সংযত হয়ে উঠেছেন। গ্রন্থটি দীর্ঘ কবিতার সংকলন, যদিও সবকটি প্রকৃত অর্থে দীর্ঘ নয়, নিশ্চিত বড় কবিতার সংজ্ঞায় পড়বে। ভালো লেগেছে 'মৃত্যুসিরিজ' কবিতাগুলি। তবে তার কবিতা এক কথায় প্রথাগত ভালো বা মন্দ বিচার করা সম্ভব নয়। কোনো গোপন রাত্রে অথবা জনবহুল অরণ্যে তার কবিতা এক ভিন্ন মাত্রায় বেজে উঠতে পারে সমস্ত লৌকিকতাকে অনড় করে।

মহাপৃথিবীর চেতনায় উড়ে আসে জীর্ণ ছায়াপথ

কোনো কবি বিশ্বাস রাখেন ভাষার সরলতায়। আবার অন্য একদল কবি মনে করেন জটিল মনোস্তত্ব, জটিল পারিপার্শিকতায় এ সময়ের ভাষা কিছুটা জটিল হয়ে উঠবে। অবশ্যই দুর্বোধ্য নয়। যথার্থ অনুশীলনে যা কখনোই কবিতার মর্মোদ্ধারে বাধা হয়ে দাড়াবে না। আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে তাদের যুক্তি নিঃসন্দেহে যোগ্যতার দাবী রাখে। আসলে একজন কবি প্রধান যে অসুবিধার সম্মুখীন হন তা হলো ভাষা ব্যবহারে। কবিতায় নিজস্ব রীতির প্রবর্তন, নিজস্ব উচ্চারণ—এই তার মুখ্য সমস্যা। তা যে পথেই তিনি যান না কেন উদ্দেশ্য একটিই, নিজস্বতা। বিশেষত তরুণ কবির ক্ষেত্রে। আর এখানেই কবি সুকুমার চৌধুরীর সার্থকতা। ব্যতিক্রমী কন্ঠস্বরে তিনি বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী সচেতনভাবে নির্মাণ চেতনার প্রসার ঘটিয়েছেন। 'ছন্নমতির কুহু' কাব্যগ্রন্থটিতে বিভাব কবিতাটি পাঠককে স্পর্শ করে; বুঝতে পারি কবির স্থান কোথায় ঃ

'এরকম আমার ভ্রমণ, এরকম
নীল অবগাহ
যে রকম পাখির উড়াল, যে রকম
ধ্বনির বিবাহ'

কবি আপাত সরল হলেও এক অতিপার্থিব গভীর উপলব্ধিতে আচ্ছন্ন। তিনি কবিতাকে অহেতুক ভাষা বা আঙ্গিক ভারাক্রান্ত করে তোলার পক্ষপাতী নন যেমন, তেমনি প্রয়োজনে স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণের সম্প্রদানেও পুরো মাত্রায় আগ্রহী। তিনি প্রাচীন শব্দভাণ্ডারকে নবপ্রবাহে অন্যমাত্রার গঠনভঙ্গিতে গ্রন্থিত করেছেন অনন্য দক্ষতায় এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

আশাবাদী এই কবি প্রতিকূলতার যন্ত্রনায় কাতর হয়ে উঠলেও বিশ্বাস রাখেন মানুষের শুভবোধ, নিসর্গ সৌন্দর্যের উপর। এ জীবন কেবল অন্ধকারের নয়। এক মহাআলোকের আভাস, তিনি সর্বক্ষণ অবচেতনে উপলব্ধি করেন। বৈচিত্রের এই সমন্বয় তার কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে; বিশিষ্ট ভাবধারায় কবিতায় তীব্রভাবে উপস্থিত সেই তাৎপর্যময়, দ্বি-মুখী অনুভব যাত্রা ঃ

'চক্রঋতুর মতো সাময়িক অথচ অমোঘ
এমন অসুখগুলি
আমাকে আহত করে, ঝলসায়
শোনো তবে
আশাহত কখনো করে না'
—পর্যাবৃত্ত

'নির্বানের দিকে হেঁটে যাব আর
হাঁটা পথে বেজে উঠবে অজস্র নির্মাণ'
—ফল্গু

অথবা

'লোভ জমাট বাঁধে, উগ্রতর হয়।
আসে পাশে লকলক কোরে ওঠে অনেক পুংক্ষোভ।
ওরা সব শিবিরের লোক। সতীর্থ আমার,
তবে ভণ্ড নয়'

এই সব উদ্ধৃতি থেকে বুঝে নিতে সক্ষম হই নিরাশায় ভোগেন না সুকুমার। তার কবিসত্ত্বা অপূর্ণতা এবং অপূর্ণতার ভিতরেই অন্য এক পূর্ণতর পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছে। আর তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন

'অন্য কোনো পৃথিবীর দিকে চলে যাবো—
যদি কোনোদিন
এভাবেই প্রাণময় হয়ে ওঠে আমার নির্মাণ'

'ছন্নমতির কুহ' বইটি থেকে এইরকম অনেক কাব্যাংশেরই উদ্ধার করা যেতে পারতো। তবে আমি একথা বলতে বাধ্য— কবিতাগুলি পড়তে পড়তে সেই ভিন্নজগতের, অতিপৃথিবীর সন্ধান পাই, যা অস্ফুট অথচ ইঙ্গিতময় সম্ভাবনায় সীমাহীন।

সুকুমার চৌধুরীর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'ছন্নমতির কুহ'। ভালো কবিতা 'নির্মাণ', 'পর্যাবৃত্ত', 'ফেরা', 'অসমাপ্ত', 'প্রাকৃত', 'শিকার', 'ফল্গু' এবং আমি আগেই বলেছি বিভাব কবিতাটি। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য নজির হয়ে উঠবেন কিনা তা বলতে পারে একমাত্র ভবিষ্যত। সমালোচকের দৃষ্টিতে নয়, আমি একজন সমকালীন পাঠকের দৃষ্টিতে বলতে পারি তার কবিতা অবশ্যই স্বতন্ত্রতার দাবী রাখে—কী ভাবে, কী ভাষায়। গভীর চেতনার উন্মেষেও তার সাফল্য সন্দেহাতীত। এর বাইরে একজন প্রকৃত কবির অন্য কি সার্থকতা থাকতে পারে!

কাউন্টের সমাধি □ শঙ্করনাথ চক্রবর্তী □ যোগসূত্র □ ২৫.০০

ছন্নমতির কুহ □ সুকুমার চৌধুরী □ খনন, নাগপুর □ ২৫.০০

সত্তরের বিশিষ্ট কবি
সলিল চক্রবর্তীর
এক অসামান্য কাব্যগ্রন্থ
মহেঞ্জোদাড়োর দিকে
পরিবেশক ঃ বুকমার্ক

Anarjyo Sahitya. New Edition 4, Dec '98 Rs 8.00

সেদিন বাড়িতে আমি আর বেলা। বাইরে অমল জ্যোৎস্না ও হাওয়া। বাগান থেকে উঠে আসছে ফুলের গন্ধ। বেলা সেই ফুলের গন্ধকে ছাপিয়েও কি লতাটির গন্ধ পাচ্ছিল? বহুদিন পর আমরা, বেলা ও আমি বাধাহীন আশঙ্কাহীন, সময়হীনভাবে শুয়েছিলাম আমার সাদা বিছানায়। সেদিন কি অপার্থিব দেখেছিলাম তাকে! বেলা চিৎ হয়ে বাঁহাতের ওপর মাথা রেখে নিশ্চিন্তে, আরামে, স্নিগ্ধ ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল। ওর গলায় ঘামের বিন্দু, তখনও। ঠোঁট রাখতে গিয়ে আমি লবণাক্ত স্বাদ পেয়েছিলাম। আমি বালিশে হেলান দিয়ে চারমিনার ধরিয়ে দেখছিলাম তাকে। ওর ঘুমন্ত, নগ্ন শরীরে আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম কোলরিজের ক্রিষ্টাবেলকে। আর তখনই অদ্ভুত মুহূর্তে আমি এক অবাস্তব, মেঘলা, নদীমাতৃক, পৌরাণিক দৃশ্যের সামনে উপস্থিত হলাম। আমার চোখের সামনে লতাটি দুলে উঠল ঈষৎ, তারপর আরও। কাঁচের জার থেকে বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে বুককেস থেকে নেমে মেঝের ওপর দিয়ে অতি সাবলীল সরীসৃপের মতো খাটে উঠে এল। আমি রুদ্ধশ্বাস বসে থাকি, দেখা ছাড়া কোন অনুভূতি নেই আর। লতাটি যেন সাপ। সেই অজানা সবুজ লতা—হাল্কা সোনালী রোমভরা বেলার ডান পা বেয়ে সাদা উরু পেরিয়ে এসে সামান্য দাঁড়ায়—যেন সে সন্ধান পেয়েছে তার প্রাচীন আশ্রয়ের। বেলার সামান্য প্রস্ফুটিত জঙ্গল-প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে পরম আদরে সে মুখ রাখে। আর সেই মুহূর্তের ভগ্নাংশকে আমার মনে হয় আকাশের মত অনন্ত। লতাটি, তার সবুজ দেহটি, ক্রমে এক পিচ্ছিল অন্ধকার পথে অদৃশ্য হয়ে যায়, আমার বেলার গভীরে।

লতাটির নাম আমার জানা হয়নি। ঘটনাটা বলাও হয়নি বেলাকে কখনো। আসলে নিজে আমি এতবেশি বিস্মিত হয়েছিলাম যে কোনও প্রশ্ন উঠে আসেনি আমার মধ্যে বরং প্রায় মৃত নদীর পাশে সন্ধ্যার নিভন্ত চিতার মত এক অমোঘ সিদ্ধান্ত আমার ভিতর গড়ে উঠেছিল। আমার মনে হচ্ছিল বেলা কোন এক মধ্যযুগীয় কাব্যের মায়াময় চরিত্র হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। আমার মধ্যে কেমন এক ভয় বা অসহায়তা। সেই নারীকে আমি আর স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারছিলাম না। আমার জীবনযাপনের দুর্বোধ্য গণিত আবার প্রকাশিত হচ্ছিল। আবারও আমি অসফল এক সময়ের মধ্যে প্রবেশ করছিলাম।

নিপা : একদিন অন্যসময়

গল্প গ্রন্থ □ শ্রীধর মুখোপাধ্যায় □ গ্রাফিত্তি

প্রকাশক:
দেবযানী মুখোপাধ্যায়
২৬২ ডি/১ কাঁকুড়গাছি
ব্লক-এ, কলকাতা ৫৫

লেজার কম্পোজ :
শিবশক্তি লেজার
১, ঠাকুরপুকুর রোড, রঙ্গনাথপুর,
কলকাতা-৭০০ ০৬৩